রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস

এন. এম. হাবিব উল্লাহ



রোহিঙ্গা জাতির
ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞান
আমাদের উচ্চ মর্যাদা
সম্পন্ন একটি জাতি
হিসেবে ভাবতে
উজ্জীবিত করবে। ...

বাংলার সোলতান
জালালউদ্দিন শাহ
(মতান্তরে নাসিরুদ্দিন
শাহ) এক বিরাট
সৈন্যবাহিনী (কিছু কিছু
তথ্যমতে পঞ্চাশ হাজার
সৈন্য) নিয়ে আরাকানের
রাজাকে স্বদেশের
স্বাধীনতা উদ্ধারে সাহায্য
করেন এবং এ
সৈন্যবাহিনীকে স্বাধীন
আরাকানের নিরাপত্তার
জন্যে স্থায়ীভাবে
আরাকানের রাজার
অধীনে ন্যস্ত করেন।
এমন মহানুভবতার
নজির পৃথিবীর ইতিহাসে
খুব কম দেখা যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাস
চর্চায় আরাকানের
ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত করা
প্রয়োজন। পঞ্চদশ শতকে
বাংলাদেশের
জনসমষ্টিরই একাংশ
স্বাধীন আরাকানের
গোড়াপত্তন করেছিল।
ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ
শতকে আরাকানের
রাজসভা ছিল বাংলা
সাহিত্য চর্চার
একমাত্র প্রাণকেন্দ্র।

আরাকান তথা রোহিঙ্গা
জাতির ইতিহাস তাই
আমাদের অতীত
ঐতিহ্যের ইতিহাস,
বাঙালি মুসলমানদের
গৌরবের ইতিহাস।

রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস

এন. এম. হাবিব উল্লাহ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস
এন. এম. হাবিব উল্লাহ

প্রকাশক ঃ
মুনাওয়ার আহমদ
সহ-সভাপতি, পরিচালনা কমিটি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ-১৪০২ বাং
এপ্রিল-১৯৯৫ ইং

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল বারিক ভুঁইয়া

বর্ণবিন্যাস ঃ অর্ণব কম্পিউটার
৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা

ROHINGA JATIR ITIHAS (HISTORY OF THE ROHINGYAS) BY N. M. HABIBULLAH, PUBLISHED BY MUNAWAR AHMAD, VICE-CHAIRMAN, BANGLADESH CO-OPERATIVE BOOK SOCIETY LTD. 125 MOTIJHEEL C/A, DHAKA-1000.

PRICE : TK. 70.00
US $ 5.00

উৎসর্গ

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

সিয়াজী উ-সান শোয়ে বু

(প্রখ্যাত আরাকানী গবেষক)

মরহুম মোহাম্মদ সিদ্দীক খান

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ গ্রন্থাগারিক)

—— যাঁদের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম বঙ্গোপসাগরের
তীরবর্তী আরাকানী সভ্যতার লুপ্ত
ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করেছে।

এই লেখকের অন্য বই
অসীমে পাড়ি
(বিজ্ঞান বিষয়ক শিশুতোষ গ্রন্থ)

মুখবন্ধ

অধ্যাপক এন. এম. হাবিব উল্লাহ রচিত ও বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত 'রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস' শীর্ষক পুস্তকখানি রোহিঙ্গাদের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় রচিত সম্ভবত ঃ সর্বপ্রথম পুস্তক।

আমরা বিভিন্ন সময় উদ্বিগ্নতার সাথে লক্ষ করি, আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশ সীমান্তে পালিয়ে আসে। পুনরায় বাংলাদেশ ও মায়ানমার সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর লক্ষ করি মায়ানমার সরকারের সম্মতিক্রমেই রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা স্বদেশে ফিরে যায়। এর মাধ্যমে আরাকানে রোহিঙ্গা জাতির নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্বের নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি মেলে।

আরাকানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচিতির উপর ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্ন কারণে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। নিঃসন্দেহে অধ্যাপক এন. এম. হাবিব উল্লাহ রচিত আলোচ্য পুস্তকখানি আমাদের সেই অভাব পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

আমরা লক্ষ করেছি, অধ্যাপক এন. এম. হাবিব উল্লাহ প্রায় দু'দশক ধরে রোহিঙ্গা জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর দেশের জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন সাময়িকী পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে আসছেন। বাংলাদেশী লেখকদের মধ্যে রোহিঙ্গাদের উপর সম্ভবতঃ তিনিই সর্বাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করা যায়, আমাদের স্মরণকালে তিন তিনবার আরাকানে রোহিঙ্গা জাতির ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্ত উত্তপ্ত হয়েছে এবং দু'সরকারের মধ্যে বহু দেন-দরবার হয়েছে।

১৯৫৮ সালে একবার রোহিঙ্গারা আরাকান থেকে নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তান ও বার্মার মধ্যে সরকারী পর্যায়ে দেন-দরবার হয়। বার্মা সরকার পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেয় এবং 'আকিয়াবের' কিছু মগ এই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল বলে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী প্রতিনিধিদের জানায়।

আরও দু'দফায় রোহিঙ্গা ইস্যুটি পৃথিবীর গণমাধ্যমসমূহে স্থান দখল করে নেয়। ১৯৭৮ সালে আরাকান হতে বিতাড়িত হয়ে কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে আসলে রোহিঙ্গা ইস্যুটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ ও বার্মা সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক দেন-দরবারের পর বার্মা সরকার সকল উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নেয়।

১৯৯২ সালের শুরু হতে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা পুনরায় উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এক্ষেত্রেও কূটনৈতিক দেন-দরবার হয়েছে এবং মায়ানমার সরকার উদ্বাস্তুদের ফেরত গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।

রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের যথেষ্টভাবে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। কেননা, এই ইস্যুটি নিয়ে সৃষ্ট বিবাদে বাংলাদেশ অন্যতম প্রতিপক্ষ।

বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় আরাকানের ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশের জনসমষ্টির একাংশ স্বাধীন আরাকানের গোড়া পত্তন করেছিল। বাংলাদেশের আমলা-মন্ত্রী, কবি-সাহিত্যিক ও কৃষক-শ্রমিকেরা গিয়ে গড়ে তুলেছিল স্বাধীন আরাকানের সোনালী যুগ। ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ শতকে আরাকানের রাজসভা ছিল বাংলা সাহিত্য চর্চার একমাত্র প্রাণকেন্দ্র।

অধ্যাপক এন. এম. হাবিব-উল্লাহ কক্সবাজারের বাসিন্দা। কক্সবাজার কলেজে তিনি বহু বছর অধ্যাপনা করেছেন। কক্সবাজার সীমান্তের ওপারে আরাকান রাজ্য। আরাকানই হলো রোহিঙ্গা জাতির আবাসভূমি। কক্সবাজারের স্থায়ী অধিবাসী ও রোহিঙ্গা জাতির মধ্যে রয়েছে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত গভীর মিল।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সীমান্তে একই জনগোষ্ঠীকে সীমান্তের দু'পাড়ে বসবাস করতে দেখা যায়। ভৌগোলিক সীমান্তের ভারত অঞ্চলে যারা 'নাগা' জাতি নামে পরিচিত, মায়ানমার সীমান্তে সেই জনগোষ্ঠী 'কাচিন' নামে পরিচিত। ভারতে যারা 'মিজো' নামে পরিচিত, মায়ানমারে একই জনগোষ্ঠী 'সীন' জাতি নামে পরিচিত। মায়ানমারে যারা 'শান' জাতি নামে পরিচিত, থাই সীমান্তের অভ্যন্তরে তারা 'থাই' জাতি নামে পরিচিত। ইতিহাসে 'মগ' নামে

পরিচিত জনগোষ্ঠী আরাকানে 'রাখাইন' নামে পরিচিত। এদের অনেককে বাংলাদেশে 'মারমা' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সঙ্গত কারণেই আমরা বলতে পারি, অধ্যাপক এন. এম. হাবিব উল্লাহ রোহিঙ্গাদের ইতিহাস গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে রোহিঙ্গাদের অতীত হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাকে সাতটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সময়ভিত্তিক ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে।

আরাকানের ইতিহাস আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অংশবিশেষ। পুস্তকটি আমাদের ইতিহাস সচেতনতার ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিহাস বিভাগ আরাকানের ইতিহাসের উপর আরও তথ্যবহুল প্রবন্ধ-পুস্তক রচনায় এগিয়ে আসবেন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,
ঢাকা।

প্রকাশকের কথা

রোঁয়াই, রোয়াং চট্টগ্রামের জনগণের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। এককালে চট্টগ্রামের মানুষ 'রোয়াং' যেতো অর্থ উপার্জনের জন্যে। এ সম্পর্কে গ্রাম্য একটি ছড়া হলো,

"ভোয়াং ভোয়াং ভোয়াং।
তর বাপ গিয়ে রোয়াং।
রোয়াং-অর টিয়া বরুনা পান।
তর মারে কইছদে ন কাঁদে পান।"

অর্থাৎ ছেলে ছড়ার মাধ্যমে তার সাথী বন্ধুকে বলছে, তোমার পিতা রোসাঙ্গ গিয়েছে অর্থ উপার্জনের জন্যে। ছেলেটি আরও জানাচ্ছে রোসাঙ্গের টাকা 'বরুনা'র সমান। বরুনা মানে রান্নার ডেকচির উপর ব্যবহৃত মাটির তৈরি ঢাকনা। অর্থাৎ রোসাঙ্গের টাকার আকার খুব বড়। অতএব ছেলেটির মায়ের কান্নাকাটি করার কোন প্রয়োজন নেই।

উপরের এই ছড়ার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। আমরা জানি এককালে চট্টগ্রাম স্বাধীন আরাকান রাজ্যের অংশ ছিল। আজকের চট্টগ্রাম শহর ও সন্দ্বীপ ছিল মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আখড়া। ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খান চট্টগ্রামকে দস্যুমুক্ত করে এর নাম দিয়েছিলেন 'ইসলামাবাদ'। মগ জলদস্যুদের অত্যাচার ও নানা কুকীর্তির কারণে বাংলার বিরাট উপকূলভাগসহ চট্টগ্রামের মানুষ এত বেশি অতীষ্ঠ হয়েছিল যে নবাব শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়কে এতদ অঞ্চলের মানুষ নিজেদের বিজয় ও ইসলামের বিজয় বলে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিল। আরাকান ছিল বাঙালি মুসলমানদের গড়া এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানে মগ এবং মুসলমানদের মধ্যে অতীত ইতিহাসে সম্প্রীতির কোন অভাব ছিল না। আরাকানের 'ম্রোহং' (রোহাং) ছিল রাজধানী শহর। অতএব চট্টগ্রামের মানুষের 'রোহাং' গমনের ঐতিহ্য এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা।

আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, আরাকানে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৩-২৪ সালে। ১৮৮৫ সালে সমগ্র বার্মা বৃটিশ দলখলভুক্ত হয়। ষাট বছরেরও অধিককাল আগে আরাকান বৃটিশ শাসনের অধীন হলেও এখানে কোন

ইন্ডাস্ট্রিয়েল বেস (Industrial Base) গড়ে ওঠেনি। সমগ্র মায়ানমারের মধ্যে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস গড়ে উঠেছিল রেংগুন কেন্দ্রীক। ফলে পতিত কৃষি জমি আবাদ করা ছাড়া আরাকানে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিশেষ কোন সুযোগ ছিল না। তখন বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই রেংগুনে সৃষ্টি হয়েছিল বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের আরও একটি দিক পর্যালোচনা করা দরকার। ১৭৮৪ সালে আরাকানীরা পুনরায় বার্মার কাছে স্বাধীনতা হারায়। এরপর থেকে লক্ষ লক্ষ আরাকানী স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে পালিয়ে আসে। আরাকান থেকে যেমন 'মগ' সম্প্রদায়ের সদস্যরা পালিয়ে এসেছিল তেমনি এসেছিল মুসলমান অর্থাৎ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ। রোহিঙ্গারা ধর্মে মুসলমান এবং বাঙালি বংশোদ্ভূত। ফলে পালিয়ে আসা মুসলমানেরা মগদের সাথে মিলে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রয়াস নেয়। সম্ভবত এখান থেকেই রোঁয়াই-চাড়ীর মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

১৮২৩-২৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম এংলো-বার্মা যুদ্ধে আরাকান বৃটিশ দখলভুক্ত হলে পর বর্মী সৈন্যরা পালিয়ে যায় এবং আরাকানে শান্তি শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা মূল্যায়ন করলে মনে হয় এ সময় দক্ষিণ চট্টগ্রামে বহু ভাসমান রোঁয়াই উদ্বাস্তুর অস্তিত্ব ছিল। সঙ্গত কারণেই এরা পুনরায় পূর্বপুরুষদের দেশ আরাকানে গিয়ে পতিত জমি আবাদ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। এরা সেদেশে বহিরাগত হিসেবে যায়নি, পূর্ব পুরুষদের বসত ভিটায় ফিরে গিয়েছিল মাত্র।

যা হোক, আমরা আশা করব আমাগী দিনের গবেষকগণ অধ্যাপক এন. এম. হাবিব উল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরন করে আমাদের লুপ্ত ইতিহাসকে আরও সুসংঘটিতভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে এগিয়ে আসবেন।

আমার মনে হয় আলোচ্য পুস্তকে লেখক এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন- যা থেকে আগামী দিনের গবেষকগণ দিক-নির্দেশনা ও প্রেরণা পাবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মুনাওয়ার আহমদ

সহ-সভাপতি, পরিচালনা কমিটি

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

লেখকের কথা

রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি কথা বার বার আমার মনে এসেছে— রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞান আমাদের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একটি জাতি হিসেবে ভাবতে উজ্জীবিত করবে। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির একটি উত্থানকাল আছে। আমার মনে হয়, কোন জাতির উত্থানকালীন সময়ের আচরণই সে জাতির আসল বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। অধিকাংশ জাতির উত্থান পর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ সমস্ত সবল জাতিসমূহ পার্শ্ববর্তী দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণ করেছে, সম্পাদ লুণ্ঠন করেছে ও তাদের অধিকার হরণ করেছে। কিন্তু বাংলার স্বাধীন মুসলিম শাসকগণ সে পথে অগ্রসর হননি। বাংলার স্বাধীন শাসকগণ পার্শ্ববর্তী দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলেন।

১৪০৬ সালে বার্মা কর্তৃক আক্রান্ত হলে আরাকানের তরুণ রাজা পালিয়ে তদানীন্তন স্বাধীন বাংলার রাজধানী গৌড়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরাজিত আরাকানীরা বার্মার কাছে স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু বাংলার সোলতান জালালুদ্দিন শাহ (মতান্তরে নাসিরুদ্দিন শাহ) এক বিরাট সৈন্য বাহিনী (কিছু কিছু তথ্য মতে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য) দিয়ে আরাকানের রাজাকে স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারে সাহায্য করেন। এবং ঐ সৈন্যবাহিনীকে স্বাধীন আরাকানের নিরাপত্তার জন্যে স্থায়ীভাবে আরাকানের রাজার অধীনে ন্যস্ত করেন। এমন মহানুভবতার নজির পৃথিবীর খুব কম জাতির মধ্যে দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাশের দশকেও 'রোয়াঁই- চাড়ি' বিবাদ দক্ষিণ চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো। রোসাঙ্গ < রোহাংগ <রোয়াং নিঃসন্দেহে একই শব্দের বিকৃতরূপ। অনেক গবেষকের মতে স্বাধীন আরাকানের রাজধানী 'ম্রোহাং' থেকে 'রোহাংগ' শব্দের উৎপত্তি।

সে যাহোক, আমার রচিত 'রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সমস্ত প্রবন্ধসমূহ সংকলন করে বর্তমান পুস্তকের আকারে রূপ দেয়া হয়েছে।

'রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস' বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রখ্যাত দার্শনিক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম কর্তৃক নির্দেশিত হয়েই আমি এই পান্ডুলিপি প্রণয়নের কাজে উজ্জীবিত হই। এ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁর ঋণ স্মরণ করছি।

পরিশেষে আমি কামনা করছি, রোহিঙ্গা বিষয়ে আরও প্রবন্ধ রচিত হোক ও গ্রন্থ প্রকাশিত হোক।

এন. এম. হাবিব উল্লাহ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মুসলমানদের আরাকান আগমনের ইতিহাস

মুসলমানদের আরাকান আগমনের প্রথম কাল

ঠিক কখন আরাকানে সর্বপ্রথম মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে তা দিন-ক্ষণ-তারিখসহ বলা না গেলেও একথা সুস্পষ্টভাবেই বলা চলে যে, আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই আরাকানের সাথে মুসলমানদের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে। বাণিজ্যিব্যাপদেশে আরবদের সাথে মহানবী (সা.)-এর জীবিতকালেই দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে আরব বণিকদের সাথে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলসমূহের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে আরবীয় মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতোই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, বঙ্গোপসাগরের উপকূলের দ্বীপসমূহে মুসলমানেরা আলাদা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে অনেক গবেষকদের ধারণা এবং অনুমান করা হয় যে, এই রাজ্যের শাসকের উপাধি ছিল 'সুলতান'।[১] ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজা ষোলচন্দ্র 'সুরতন' অভিযানে বের হন। চন্দ্রবংশীয় রাজবংশের ঐতিহাসিক উপাখ্যান 'রাদ্‌জাতুয়ে'-এর বর্ণনা মতে, রাজা ষোলচন্দ্র 'সুরতন' অধিকার করে সেখানে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন এবং বিজয়স্তম্ভের গায় লিখে দেন 'চেত্তাগৌং— যার অর্থ 'যুদ্ধ করা সমিচীন নয়।'[২] পরবর্তীতে চেত্তাগৌং শব্দটি বিকৃত হয়ে চট্টগ্রাম হয়েছে বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। অনেক গবেষকের ধারণা 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' শব্দেরই বিকৃতরূপ। তবে এই অনুমানটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা না গেলেও এ অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৩]

আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজবংশের সংরক্ষিত ইতিহাস 'রদ্‌জাতুয়ে'-এর উল্লেখ অনুসারে, রাজা মহত ইং চন্দ্রের রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০) একটি আরবীয় বাণিজ্যবহর আরাকানের রামব্রী উপকূলে আঘাত খেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জাহাজের আরোহীরা ভাসতে ভাসতে উপকূলে এসে ভিড়লে পর রাজা

পড়লে মোমের উপর সীলমোহরের মতো অংকিত হয়, যে কুঠির সুগন্ধ দশ ফরসক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, যে বাদশাহর খাজাঞ্চিখানায় এক হাজার পিতৃপুরুষের জহরতের মুকুট রয়েছে, যা আমার এক হাজার পূর্ব-পুরুষ রাজ্য শাসনকালে তৈরি করেছিলেন, আমি রুহমী রাজ্যের সেই বাদশা যে পরাক্রমশালী বাদশাহকে এ দেশের প্রধান ধর্মগুরু কুর্ণিশ করে, যে বাদশাহর খাজাঞ্চিখানায় দশ লক্ষ মিসকান স্বর্ণের মওজুদ আছে, এই বাদশাহর আস্তাবলে এক হাজার সাদা হাতি আছে। প্রজার প্রতি ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য এই বাদশাহ অত্যন্ত যত্নবান।" খলিফা আল মামুন এই চিঠির উত্তরে লিখেন- "আবদুল্লা মামুন বিল্লাহ আমিরুল মুমেনিন, যাঁকে এবং যাঁর পিতৃপুরুষকে আল্লাহ অনেক মর্যাদা দান করেছেন। যাঁর পিতৃপুরুষের চাচাত ভাইকে আল্লাহ নবী হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর কিতাবের উপর আমরা ঈমান এনেছি। রুহমী বাদশাহ, যিনি হিন্দের অন্যতম বাদশাহ, যার অধীনে ছোট ছোট সর্দার আছে। আমি এমন বাদশাহর তারিফ করতে পারি না যিনি ইসলাম কবুল করেননি।"[৭] ৩৪০ হিজরীতে আল-মাসুদ লিখিত মুরউস-আল যাহাব ওয়া মা' আদীনুল জওহর" গ্রন্থে রুহমী রাষ্ট্রের বর্ণনা রয়েছে। তাঁর বর্ণনা মতে, "রুহমী নামের চাইতেও এটি বাদশাহর উপাধি হিসাবে অধিক ব্যবহৃত হয়। রুহমীর সাথে সংলগ্ন জজরের বাদশাহ্ লড়াই করে। এই দেশে এক প্রকার জানোয়ার আছে, যাকে স্থানীয় জনসাধারণ গন্ডার নামে অভিহিত করে থাকে। হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা এই প্রাণীর মাংস খায়। কেননা গন্ডার গরু ও মহিষ জাতীয় প্রাণী"।[৮]

উপরের এই আলোচনা হতে দেখা যায়, আরাকানের সাথে আরব বিশ্বের যোগাযোগ সুপ্রাচীন এবং সপ্তম-অষ্টম শতকেও আরাকানে মুসলমানদের বসবাস ছিল।

মুসলমানদের আরাকান আগমনের দ্বিতীয় কাল:

বৃহৎ সংখ্যায় মুসলমানদের আরাকানে আগমন ঘটে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নরমিখলা ওরফে মোহাম্মদ সোলাইমান শাহ-এর মাধ্যমে।[৯] নরমিখলা চন্দ্র-সূর্য বংশের রাজা অযুথুর পুত্র। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে অযুথুকে হত্যা করে নরমিখলার চাচা রাজধানী লংগ্রেত এর পৈতৃক সিংহাসন দখল করেন। অতঃপর ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়স্ক

যুবরাজ 'নরমিখলা' স্বীয় চাচাকে উৎখাত করে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১] সিংহাসনে আরোহণ করেই নরমিখলা অননথিউ নামক জনৈক সামন্তরাজার রূপসী ও বিবাহিতা ভগ্নী 'সাঁ-বুঁ-ইউ"কে অপহরণ করে রাজধানী লংগ্রেত-এ নিয়ে আসেন।[২] প্রকৃতপক্ষে সাঁ-বুঁ-ইউ ছিল অপর এক সামন্তরাজার স্ত্রী। এঘটনায় মর্মাহত হয়ে সকল সামন্তরাজাগণ একজোট বেঁধে সাঁ-বুঁ-ইউকে ফেরত দেয়ার জন্য নরমিখলাকে অনুরোধ জানায়। নরমিখলা এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে পর সামন্তরাজাগণ ক্ষিপ্ত হয়ে বার্মার রাজাকে আরাকান আক্রমণ করার জন্যে প্রলুব্ধ করে। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে বার্মার রাজা মেং শো আই (MENG-TSHWAI. রাজত্বকাল ঃ ১৪০১-১৪২২)ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান অক্রমণ করেন।[৩] নরমিখলা প্রাণভয়ে পালিয়ে তদানিন্তন বাঙলার রাজধানী গৌড়ে এসে আশ্রয়গ্রহণ করেন। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন শাহ সেনাপতি ওয়ালী খানের নেতৃত্বে বিশ হাজার গৌড়ীয় সৈন্য দিয়ে নরমিখলাকে স্বদেশভূমি উদ্ধারের জন্য সাহায্য করেন।

কিন্তু ওয়ালীখান বর্মী বাহিনীকে বিতাড়িত করে আরাকানে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন বটে, তবে তিনি নিজেকেই আরাকানের একজন স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করেন। ফলে নরমিখলা পুনরায় গৌড়ে পালিয়ে আসেন। পরবর্তী বছর সুলতান জালালুদ্দিন শাহ সেনাপতি সিন্ধীখানের নেতৃত্বে আবার ত্রিশ হাজার সৈন্য দিয়ে নরমিখলাকে স্বদেশভুমি উদ্ধারের জন্য সাহায্য করেন। সিন্ধী খান আরাকান পৌঁছার আগেই ওয়ালী খান পালিয়ে যান। সকল গৌড়িয় সৈন্য সিন্ধী খানের বৈশ্যতা স্বীকার করেন। রাজধানী 'ম্রোহং' শহরে 'সিন্ধীখানের মসজিদের ধ্বংশাবশেষ এখনও পরিলক্ষিত হয়। এভাবে পঞ্চাশ হাজার গৌড়িয় সৈন্যের সহায়তায় পিতৃভূমি উদ্ধার করে নরমিখলা 'ম্রাউক-উ' নামক এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। লেম্রো (Lembru) নদীর তীরে ম্রোহং ছিল এ বংশের রাজধানী। আগত পঞ্চাশ হাজার গৌড়িয় সৈন্য ম্রাউক-উ বংশের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

গৌড়ের করদ রাজ্য হিসেবে ম্রাউক-উ রাজবংশ

প্রকৃতপক্ষে একটি সন্ধির মাধ্যমেই গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন শাহ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়ে নরমিখলাকে স্বদেশভুমি উদ্ধারে সাহায্য করেন। প্রধান শর্তটি ছিল, আরাকানের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে সত্য, কিন্তু

আরাকানের শাসকদের গৌড়ের করদ রাজ্য হিসাবে বাৎসরিক কর প্রদান করতে হবে।

১৪৩০ খৃঃ হতে ১৫৩০ খৃঃ পর্যন্ত মোট একশত বছর আরাকানের ম্রাউক-উ বংশের শাসকগণ গৌড়ের শাসকদের কর প্রদান করেন। নরমিখলা মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে ম্রাউক-উ বংশের গোড়া পত্তন করেন। করদ রাজ্য হিসাবে এই একশ' বছরে মোট এগারজন শাসনকর্তা রাজ্যশাসন করেছেন।[১০]

এ সময় ম্রাউক-উ বংশের শাসকগণ গৌড়ের অনুকরণে মুদ্রাব্যবস্থা চালু করেন। মুদ্রার এক পিঠে ফার্সী ভাষায় কলেমা এবং অপর পিঠে রাজার মুসলিম নাম ও সিংহাসনে আরোহণকাল খোদাই করা হয়।[১১]

অনেক তুর্কী ও পাঠান যোদ্ধারা ভাগ্যের অন্বেষণে আরাকানে আগমন করেন ও বসতি স্থাপন করেন।

স্বাধীন ম্রাউক-উ রাজবংশ

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ম্রাউক-উ বংশের দ্বাদশতম পুরুষ 'মিনবিন' জেবুক শাহ নামধারণ করে তৎকালীন আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এর সিংহাসনে আরোহন করেন। গৌড়ের স্বাধীন রাজশক্তির পতন ঘটলে পর জেবুক শাহ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর থেকে দু'ভাবে আরাকানে ব্যাপকভাবে বাঙালি মুসলমানদের সমাগম ঘটতে থাকে।

বঙ্গভুমি দিল্লীর মোগল শক্তির পদানত হয়ে পড়লে আরাকানে গৌড়ের সমরকুশলী ও রাষ্ট্রীয় কুশলীদের কদর বৃদ্ধি পায়। অগ্রসরমান দিল্লীর মোগলশক্তিকে আরাকানীরা ভয়ের চোখে দেখতো। তাই আরাকানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ম্রোহং-এর রাজা অর্থাৎ রোসাঙ্গরাজ বদ্ধপরিকর হয়। ফলে গৌড়ের কুশলীরা আরাকানে গিয়ে রোসাঙ্গরাজের অধীনে সমবেত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, রোসাঙ্গের বাঙালি কবি নসরুল্লাহ খানের ৭ম পূর্বপুরুষ বোরহানউদ্দিন খান গৌড় থেকে রোসাঙ্গে গিয়ে অশ্ব আসোয়ার বাহিনীর সূচনা করেন। পরবর্তীতে বোরহানউদ্দিন খানের সন্তান সন্ততিগণ আরাকানের সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন।[১৩]

আরাকানে মুসলমানদের আগমনের তৃতীয় কাল

বাঙালি মুসলমানদের তৃতীয় প্রক্রিয়ায় আরাকানে পদার্পণের ঘটনাটি বিভৎস, লোমহর্ষক ও মর্মান্তিক কাহিনীতে ভরপুর।

বলা বাহুল্য, জেবুকশাহ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের বৈশ্যতা ছিন্ন করে আরাকানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময় বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় আবির্ভূত হয় দক্ষ নৌশক্তির অধিকারী পর্তুগীজ জলদস্যুগণ। সম্ভাব্য মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জেবুক শাহ পর্তুগীজ প্রশিক্ষকদের সহায়তায় আরাকানের মগ বৌদ্ধদের নিয়ে একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। মগেরা পর্তুগীজ প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে নৌযুদ্ধ বিদ্যা অর্জনের সাথে সাথে জলদস্যুবৃত্তিতেও পারদর্শি হয়ে ওঠে।

মগ-দস্যুরা মেঘনা নদীর মোহনা দিয়ে উজানে প্রবেশ করে দুই পার্শ্বের জনবসতিসমূহ উজাড় করে ফেলত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষদের বন্দী করে দাস হিসাবে আরাকানে প্রেরণ করত। দুর্গম আরাকানের জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি উপযোগী করে তোলার জন্য রোসাঙ্গরাজ বন্দীদের নিয়োজিত করত। এভাবে বাংলার নিম্ন অঞ্চলকে উজাড় করে বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে আরাকানে এক বিপুল জনশক্তি গড়ে তোলা হয়।

শাহসুজা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ভারতীয় মুসলমানদের আরাকান আগমন

এক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের হাতে পরাজিত হয়ে মোগল যুবরাজ শাহ সুজা কয়েকশ' অনুচর নিয়ে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আরাকান গমন করেন। রোসাঙ্গরাজ চন্দ্র-সু-ধর্মার হাতে শাহ সূজা ও তৎপরিবারের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলে তার অনুচরবর্গ আরাকানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। কেননা, সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে শাহ সূজার অনুচরদের জন্য ভারতে বসবাস শংকাহীন ছিল না।

এদিকে শাহ সূজার করুণ মৃত্যুতে সারা ভারতের মুসলমানগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ভারত থেকে দলে দলে মুসলমানগণ আরাকানে গিয়ে জমায়েত হয়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মগ দস্যুদের সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে নবাব শায়েস্তা খান রোসাঙ্গরাজার কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করে নেন। এতে রোসাঙ্গরাজ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। রোসাংগের মুসলিম

শক্তি খোলা তলোয়ার নিয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সমগ্র রোসাংগ রাজ্য ছারখার করে দেয়। তাদের ইচ্ছার উপর রাজা ক্ষমতায় বসে এবং তাদের ইচ্ছার উপর রাজা ক্ষমতাচ্যুত হয়। অতঃপর ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সান্দ উইজা নামক আরাকানের জনৈক সামন্ত উন্মত্ত মুসলিম শক্তিকে রামব্রীতে প্রচুর জমি দিয়ে বসতি স্থাপন করান এবং আরাকানের উপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮]

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্মার রাজা ভোদাপায়া আরাকান আক্রমণ করেন এবং আরাকানকে বার্মার একটি প্রদেশে পরিণত করেন। বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মগ-মুসলিম নির্বিশেষে আরাকানের জনগণ পালিয়ে আসতে থাকে।[১৯] আরাকানী মুসলমানগণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করেন এবং মগেরা কক্সবাজারসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বর্মী সৈন্যদের বিরুদ্ধে এক মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আরাকানসহ সমগ্র বার্মা বৃটিশদের দখলে চলে যায়।

বৃটিশ শাসন আমলে বর্মী দখলকৃত আরাকান থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদের একটি অংশ পুনরায় আরাকানে ফিরে যায়। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হলে আরাকান বার্মার দখলেই থেকে যায়। আর বার্মার স্বাধীনতার পর হতেই আরাকান থেকে মুসলমানেরা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে শুরু করে এবং অদ্যাবধি আরাকান থেকে মুসলমানদের পালিয়ে আসা অব্যাহত রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গোপসাগরীয় সভ্যতায় মুসলিম আরাকান

আরাকান-বার্মা সম্পর্ক ও আরাকানীদের সর্বনাশঃ

ইতিহাস বলে, বার্মার সাথে আরাকানীদের সম্পর্ক সদা-সর্বদা আরাকানীদের সর্বনাশ সাধন করেছে। বর্মীদের কাছে আরাকানীরা নিগৃহীত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার চেতনায় গর্বিত আরাকানীরা হারিয়েছে তাদের প্রিয় স্বাধীনতা। পক্ষান্তরে বাংলা-আরাকান সম্পর্ক আরাকানীদের জন্য এনে দিয়েছে স্বাধীনতা ও জাতিগত মর্যাদা।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান আরাকান উপকূলে অবস্থিত রামব্রীদ্বীপের অধিবাসী 'থামাদা' নামে জনৈক ব্যক্তি আরাকানের রাজধানী 'ম্রোহং'-এর ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলে পর সুদীর্ঘকালের গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত স্বাধীন আরাকানের রাজনৈতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে পড়ে।[১০] এই প্রসঙ্গটি অনুধাবনের সুবিধার্থে আরাকানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিধারার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উল্লেখ্য, স্বঘোষিত রাজা থামাদার ক্ষমতা রাজধানী ম্রোহং-এর চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরও ছ'জন অভিজাত বংশীয় সামন্তরাজা রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নিজেদের রাজা বলে দাবি করত। এর মধ্যে কোন একজন সামন্তরাজা ম্রোহং দখলের চেষ্টা করলে অপর সামন্তরা জোট বেধে এ উদ্যোগকে অসম্ভব করে তুলতো।[১১] ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দকাল পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ বছরে তেরজন রাজা সর্বাধিক পাঁচ বছরের অধিক রাজধানী ম্রোহং-এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। এমনকি অনেকের শাসনকাল একদিনও স্থায়ী হয়নি।[১২]

অতঃপর অরাজকতার চরম এক পর্যায়ে থামাদা রাজধানী অধিকার করে নিলে পর সামন্তরাজারা ঘা-থানডি (Nga-Than-De) নামক জনৈক অভিজাতের নেতৃত্বে তদানিন্তন বার্মার রাজধানী আভায় গিয়ে বার্মার রাজা ভোদাপায়াকে আরাকান দখলের জন্যে অনুরোধ করে। বলাবাহুল্য, অভিজাতদের এই কান্ডকীর্তিতে দেশপ্রেমের চাইতে ক্ষমতার লোভই অধিক কার্যকর ছিল।[১৩]

ব্রহ্মদেশীয় আভার রাজা ভোদাপায়া এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে আরাকানে আসলে গ্রামের লোক মহানন্দে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বর্মী সৈন্যদের স্বাগত জানায়।[২৪] কোন বাধা ছাড়াই বর্মী বাহিনী আরাকান দখল করে নেয়। আর এর সাথে চিরতরের জন্যে বিলুপ্ত হয় হাজার বছরের আরাকানের স্বাধীনতা এবং পরিসমাপ্তি ঘটে সুদীর্ঘ চারশ' বছরের বঙ্গোপসাগরীয় সভ্যতার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের পালাগীতি ও লোককাহিনীতে হাওয়া রাজার কথা উল্লেখ আছে। আভার রাজাই বিকৃত হয়ে হাওয়া রাজা হিসেবে এতদ অঞ্চলের লোক কাহিনীতে বিধৃত হয়ে রয়েছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে অধিকতর সুসভ্যতার অধিকারী আরাকানের জনগোষ্ঠী বার্মার কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারেনি। অপর পক্ষে বার্মার রাজাই আরাকান থেকে শিখেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

In her previous connections with outside states, Arakan had always been gained. As feudatory to Bengal she (Arakan) had laid the foundations of her age. But administered as a Governorship by the Burmese of the 18th century, she had nothing to gain, for the Burmese had nothing to teach a country which for centuries had been in touch with the world of thought and action through the Muslim Sultanates at a time when Burma herself was isolated and backward.[২৫] (অর্থাৎ, বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ফলে আরাকান সবসময় লাভবান হয়েছে। বঙ্গদেশের করদরাজ্য হিসেবে আরাকানকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সূচিত হয় এক মহাযুগের। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বার্মার অধীনস্থ একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়ে আরাকানীদের লাভ করার কিছুই ছিল না। কেননা বর্মীদের আরাকানীদের মত এমন এক জাতিকে শেখানোর মত কিছুই ছিল না, যে আরাকানী জাতি কয়েক শতাব্দী ধরে জ্ঞান-গরিমার উচ্চ শিখরে আরোহণকারী মুসলিম সমাজের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে ছিল। এই সময় বর্মীরা ছিল বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাৎপদ একটি জাতি)।

ভোদাপায়া আরাকান দখল করে এর স্বাধীন অবস্থার বিলুপ্তি ঘটান। অথচ ঘা-থানডির সাথে প্রতিজ্ঞা ছিল, ভোদাপায়া আরাকানের স্বাধীন অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখবেন আর বিনিময়ে আরাকান বার্মার রাজাকে বাৎসরিক কর প্রদান করবে,

যেমনটি করেছিল ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের গৌড়ের সুলতান জালালউদ্দিন শাহ।[২০]

যা হোক, ভোদাপায়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান দখল করে বার্মাকে একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত করলেন এবং থা-থানডিকে নিয়োজিত করলেন প্রাদেশিক গভর্ণর হিসাবে।

বৌদ্ধের **মহামুনী মূর্তিকে** আরাকানের বৌদ্ধেরা তাদের স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক প্রতীক বলে মনে করতো। ভোদাপায়ারও ধারণা ছিল **মহামুনী মূর্তি** আরাকানে থাকলে এ দেশকে অধীন রাখা যাবে না। তাই ভোদাপায়া মহামুনী মূর্তি আরাকান থেকে সরিয়ে ভোদাপায়া বার্মার মান্দালয়ে স্থানান্তরিত করেন। আরাকানে এসে সর্বপ্রথম মুদ্রাব্যবস্থার সাথে পরিচিত হন। ইতিপূর্বে বার্মার কোন রাজার নিজস্ব কোন মুদ্রা ছিল না। The Burmese had never used coins and hence he had no model of his own. He copied therefore the (Coin of) muslim design.[২১] উল্লেখ্য, আরাকানের মুদ্রা মুসলিম শিল্পের অনুকরণে তৈরি হতো। তাছাড়া আরাকানের বিচারব্যবস্থা দেখে ভোদাপায়া আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই বিচার ব্যবস্থাও মুসলিম রীতিনীতি অনুসারে পরিচালিত হতো। অতএব, নিজ দেশে আরাকানের অনুরূপ মুদ্রা ও বিচারব্যবস্থা চালু করার জন্য ভোদাপায়া তিন হাজার সাত'শজন মুসলিম আরাকান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মান্দালয় শহরের উপকণ্ঠে বসতি করান। এদের অনেকে ভোদাপায়ার মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেন। এই তিন হাজার সাত'শ মুসলমানদের বংশধরেরা এখনো থুম টং খুইয়া (THUM HTAUNG KHUNYA) বা তিন হাজার সাত'শ বলে পরিচিত।[২২] ভোদাপায়ার পরবর্তী রাজা বার্মার মুসলমান হাজীদের সুবিধার্থে আরবে একটি মুসাফিরখানাও তৈরি করে দেন। এখনো পবিত্র মদীনা শরীফে এই মুসাফিরখানাটির অস্তিত্ব রয়েছে।

বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা হারিয়ে আরাকানের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তাছাড়া আরাকানীদের উপর বর্মী সৈন্যদের চরম নির্যাতন এবং জনগণের উপর ভোদাপায়ার অতিরিক্ত কর আরোপ প্রভৃতিতে আরাকানের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তদুপরি, আরাকানী বৌদ্ধদের প্রিয় মহামুনি মূর্তি বার্মায় স্থানান্তরিত হলে পর জনগণের মনের উপর পড়ে এক প্রবল আঘাত। কথিত আছে, আরাকান থেকে লুণ্ঠিত মাল ও বিশাল মহামুনী মূর্তি দুর্গম পার্বত্য পথ দিয়ে বার্মার মান্দালয়ে স্থানান্তর করতে হাজার হাজার মগ-মুসলিম আরাকানীদের জোরপূর্বক

নিয়োগ করা হয়। দুর্গম 'আন্' গিরিপথ দিয়ে এই স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে বর্মী সৈন্যদের নির্যাতনের ফলে আরাকানের ম্রোহং থেকে মান্দালয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ আরাকানীদের লাশে ভরে গিয়েছিল। এখনও ম্রোহং থেকে আন-গিরিপথ পর্যন্ত এলাকা জনবসতি বিরল।

ভোদাপায়ার আরাকানের ক্ষমতা দখলের মাত্র এক বছরের মধ্যেই ঘা-থানডির উপর ঘটে যায় আরেক প্রবল আঘাত। ভোদাপায়া শ্যাম রাজ্য (বর্তমান থাইল্যান্ড) আক্রমণের জন্যে চল্লিশ হাজার সৈন্য ও চল্লিশ হাজার মুদ্রা চেয়ে ঘ্য-থানডির উপর আদেশ জারি করলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রকট দারিদ্র্যের সর্ব নিম্নতম অবস্থানে নিপতীত আরাকানের জনগণের পক্ষে এর শতাংশ ভাগ পূরণও সম্ভব ছিল না। চাপের মুখে ঘা-থানডি দাবির অর্ধেক কোনভাবে পূরণে রাজি হলে ভোদাপায়া রাগান্বিত হয়ে ঘা-থানডির এক ছেলেকে হত্যা করেন। পুরো দাবী আদায় না হলে পরিবারের সবাইকে অনুরূপ হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। ফলে ভীত হয়ে ঘা-থানডি, কয়েক হাজার অনুচর নিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত সীমান্তবর্তী কক্সবাজার জেলার গভীর পার্বত্য অঞ্চলে। আর এরই সাথে শুরু হয় আরাকানীদের মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রাম। অদৃষ্টের পরিহাস, যার অনুপ্রেরণায় ভোদাপায়া আরাকান দখল করলো, তারই নেতৃত্বে মাত্র এক বছরের মধ্যে শুরু হলো একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। আর একই গণযুদ্ধের কপালের লিখন হিসেবে জন্ম নিলো ঐতিহাসিক শহর কক্সবাজার। বস্তুতঃ কক্সবাজার শহর বঙ্গোপসাগরের পাড়ে হারিয়ে যাওয়া এই সভ্যতার স্মৃতি বহন করছে।

রোসাঙ্গ রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে রোসাঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত আরাকানের ইতিহাস জানার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয় বাংলার রাজধানী গৌড়ের ইলিয়াস শাহী রাজবংশের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনুকূল্যে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে গৌড়ের পতনের পর আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভাই হয়ে পড়ে বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র। সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার বাঙালি কবি দৌলত কাজী, আলাওল, মরদন, নসরুল্লা খান প্রমুখ আরাকানকে রোসাঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। এদের রচিত কাব্যগ্রন্থে দেখা যায়ঃ

(ক) কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী, রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।

(সতী ময়না ঃ দৌলত কাজী)

(খ) তার পাছে শাহ সূজা নৃপ কুলেশ্বর, দৈব বিপাকে আইলো রোসাঙ্গ শহর।

(সয়ফুল মুলুক ঃ আলাওল)

(গ) তখন রোসাঙ্গ দেশে কিবা আদ্য কিবা শেষে অশ্ব আসোয়ার না আছিল।

(জংগনামা ঃ নসরুল্লা খান)

এছাড়াও আরাকানের মুসলমানেরা নিজেদের রোহিঙ্গা বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। তদুপরি দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার অধিবাসীরা যে উপ-আঞ্চলিক ভাষা কথায় বলে, তা রোঁয়াই ভাষা হিসেবে খ্যাত। মাত্র তিন দশক আগেও সমগ্র চট্টগ্রাম জুড়ে রোঁয়াই ও চাড়ি বলে খ্যাত দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত এতই তীব্র ছিল যে, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মরহুম আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী এ নিয়ে অনেক উষ্মা প্রকাশ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি

নিঃসন্দেহে রোঁয়াই, রোহিঙ্গা এবং রোসাঙ্গ শব্দগুলো পরিমার্জিত হয়ে বাঙালি কবিদের কাছে রোসাঙ্গ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে এবং স্থানীয় জনগণের কাছে রোয়াং হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

রোয়াং কিংবা রোসাঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নানামত পোষণ করে থাকেন। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডঃ আহমদ শরীফ প্রমুখ মনে করে থাকেন— আরাকানের পূর্বতন রাজধানী ম্রোহং শব্দটি বিকৃত হয়ে রোয়াং> রোহাংগ> রোসাংগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। চট্টগ্রামীদের কাছে, এমনকি আরাকানের রোহিঙ্গাদের কাছে ম্রোহাং পাথুরী কিল্লা বলে পরিচিত।

বাংলা-আরাকান সম্পর্ক ও আরাকান সভ্যতা

১৪০৪ খৃষ্টাব্দে নরমিখলা নামে আরাকানের জনৈক যুবরাজ মাত্র ২৪ বছর বয়সে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজধানী ছিল লেম্ব্রো (LEMBRO)

নদীর তীরে লংগ্রেত। সিংহাসনে আরোহণ করেই নরমিখলা একজন দেশীয় সামন্তরাজার ভগ্নিকে অপহরণ করে রাজধানী লংগ্রেতে নিয়ে আসেন। ফলে আরাকানের সামন্তরাজাগণ একত্রিত হয়ে বার্মার রাজা মেঙশো আইকে আরাকান দখল করার জন্যে অনুরোধ জানান। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে বার্মার রাজা ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখলা পালিয়ে তদানিন্তন বাংলার রাজধানী গৌড়ে এসে আশ্রয় নেন। তখন ইলিয়াস শাহী রাজবংশ গৌড় থেকে বাংলা শাসন করতো। কথিত আছে, নরমিখলা গৌড়ে এসে সুফী মোহাম্মদ জাকের নামক জনৈক বিখ্যাত কামেল ব্যক্তির আস্তানায় আশ্রয় নেন। অতঃপর উক্ত পীরের সহায়তায় নরমিখলা গৌড়ের রাজপ্রাসাদে স্থান পান।[::] যাহোক, নরমিখলা সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরকাল গৌড়ে অবস্থান করেন এবং ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা ও রাজনীতি অধ্যায়ন করেন। He turned away from what was Buddhist and familiar to what was Mohamedan.[::] চব্বিশ বছর পর ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের গৌড়ের সুলতান নাসিরউদ্দিন শাহ মতান্তরে জালালুদ্দিন শাহ সেনাপতি ওয়ালী খানের নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্য বাহিনী দিয়ে নরমিখলাকে স্বীয় রাজ্য আরাকান উদ্ধারের জন্যে সাহায্য করেন। উল্লেখ্য, নরমিখলা ইতিমধ্যে নিজের বৌদ্ধনাম বদলিয়ে মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করেন। ফলে বার্মার ইতিহাসে তিনি মোহাম্মদ সোলায়মান (মংস মোয়ান) হিসেবে পরিচয় লাভ করেন। গৌড়ীয় সৈন্যের সহায়তায় নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ আরাকান অধিকার করে ম্রাউক-উ নামক এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আর এর সাথে শুরু হয় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এক শ্রেষ্ঠ সভ্যতার। In this way Arakan became definitly oriented towards the Moslem states, contact with a modern Civilization resulted in a renaissance. The Country's great age began.[::] অর্থাৎ এভাবে আরাকান নিশ্চিতভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে, একটি আধুনিক সভ্যতার সাথে এই সম্পর্ক আরাকানে এনে দেয় এক রেনেসাঁ। আরাকানী জাতির এক মহাযুগ শুরু হয়।

১৪৩০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ওয়ালী খানের নেতৃত্বে নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ আরাকান অধিকার করার এক বছরের মধ্যেই ওয়ালী খান বিদ্রোহ করে নিজেই আরাকান দখল করে নিলে পর গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন শাহ সেনাপতি সিন্ধিখানের নেতৃত্বে আবার ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে সোলায়মান শাহকে (নরমিখলা) সাহায্য করেন। সিন্ধী খানের নামে

একটি মসজিদ এখনো ম্রোহং বা পাথুরী কিল্লাতে রয়েছে। অতঃপর সকল গৌড় থেকে আগত সৈন্যরা আরাকানেই বিশেষ রাজকীয় আনুকূল্যে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধী খানের সহযোগিতায় সোলায়মান শাহ পিতার রাজধানী লংগ্রেত থেকে ম্রোহং নামক স্থানে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ম্রাউক-উ বংশের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান গৌড়ের সুলতানদের কর প্রদান করতো।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে সোলায়মান শাহের দ্বাদশতম অধঃস্তন পুরুষ জেবুক শাহ (মিনবিন) ম্রোহং-এর সিংহাসনে আরোহণ করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জেবুক শাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ম্রাউক-উ-সাম্রাজ্য। With him (Zabukshah) the Arakanese graduated in their Moslem studies & the Empire was founded.[::] উল্লেখ্য, ১৪৩০ খৃঃ হতে ১৭৮৪খৃঃ পর্যন্ত, শেষের কিছু কাল বাদ দিলে, আরাকান ম্রাউক-উ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। এ সময়ে প্রায় প্রত্যেক রাজা নিজেদের বৌদ্ধ নামের সাথে একটি মুসলিম নাম ব্যবহার করেছেন। ফার্সী সরকারী ভাষা হিসাবে চালু হয়। গৌড়ের মুসলমানদের অনুকরণে মুদ্রা প্রথার প্রবর্তন হয়। মুদ্রার একপিঠে রাজার মুসলিম নাম ও অভিষেক কাল এবং অপরপিঠে মুসলমানদের কলেমা আরবী হরফে লেখা হয়।[::] রাজার সৈন্যবাহিনীতে অফিসার থেকে সৈনিক পর্যন্ত প্রায় সবাইকে মুসলমানদের মধ্য থেকে ভর্তি করানো হতো। মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশই মুসলমান ছিল। কাজী নিয়োগ করে বিচারকার্য পরিচালিত হতো। অপর এক রাজা সেলিম শাহ বার্মার মলমিন থেকে বাংলার সুন্দরবন পর্যন্ত বিরাট ভূভাগ দখল করে দিল্লীর মোগলদের অনুকরণে নিজেকে বাদশাহ উপাধীতে ভুষিত করেন। নিঃসন্দেহে তদানিন্তন শ্রেষ্ঠ সভ্যতা তথা মুসলিম আচার-আচরণ অনুকরণে এসে আরাকানের সমাজ জীবন পরিচালিত হয়েছে সুদীর্ঘ প্রায় চারশ' বছরকাল। যাকে রোসাঙ্গ সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

রোহিঙ্গা পরিচিতি

আরাকানের ইতিহাস মূল্যায়নের স্বার্থে আর একটি দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। খৃষ্টীয় ৮ম/৯ম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজারা আরাকান শাসন

করতো। উজালী ছিল এ বংশের রাজধানী। বাংলা সাহিত্যে যা বৈশালী নামে খ্যাত। এ বংশের উপাখ্যান রাদ জা-তুয়ে'তে নিম্নরূপ একটি আখ্যান উল্লেখ আছে। কথিত আছে, এ বংশের রাজা মহত ইং চন্দ্রের রাজত্ব কালে (৭৮৮-৮১০ খৃঃ) কয়েকটি বাণিজ্য বহর রামব্রী দ্বীপের তীরে এক সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে। জাহাজের আরবীয় আরোহীরা তীরে এসে ভিড়লে পর রাজা তাদের উন্নততর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আরাকানে বসতি স্থাপন করান। আরবীয় মুসলমানগণ স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জনশ্রুতি আছে, আরবীয় মুসলমানেরা ভাসতে ভাসতে কুলে ভিড়লে পর 'রহম' 'রহম' ধ্বনি দিয়ে স্থানীয় জনগণের সাহায্য কামনা করতে থাকে। বলা বাহুল্য, রহম একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ দয়া করা। কিন্তু জনগণ মনে করে এরা রহম জাতীর লোক। রহম শব্দই ।বকৃত হয়ে রোয়াং হয়েছে বলে রোহিঙ্গারা মনে করে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ আরব ভৌগোলিক সুলায়মান ৮৫১ খৃঃ রচিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিলসিলাত উত তাওয়ারীখ' নামক গ্রন্থে বঙ্গোপসাগরের তীরে রুহমী নামক একটি দেশের পরিচয় দিয়েছেন। যাকে আরাকানের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা যেতে পারে।

ষোড়ষ শতকের কবি শা'বারিদ খান 'হানিফা ও কায়রা পরী' শীর্ষক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে কল্পিত কাহিনী নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি তৈরি হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রা) পুত্র মোহাম্মদ হানিফার সাথে সহিরাম রাজার যুদ্ধ, কায়রা পরীর সাথে হানিফার বিয়ে, অতঃপর দুর্মিক রাজার ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাব্য গ্রন্থটি লিখিত। শা'বারিদখানের পরপর সপ্তদশ শতকের আরও একজন কবি মুহম্মদ খানও একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে 'জৈগুন বিবি কর্তৃক শাহপরীর কন্যা কায়রা পরীকে অপহরণ। অতঃপর রোকাম শহরে গিয়ে মোহাম্মদ হানিফার কায়রা পরীকে উদ্ধার ও উভয়ের বিয়ে ইত্যাদি।'[৭]

কক্সবাজারের টেকনাফ থানায় শাহপরীর দ্বীপ বলে একটি স্থান রয়েছে। টেকনাফের অদূরে আরাকানের মংডু শহরের সন্নিকটস্থ সুউচ্চ দু'টি পাহাড়ের চূড়ার একটির নাম হানিফার টংকী এবং পার্শ্ববর্তী অপরটি কায়রা পরীর টংকী বলে খ্যাত। আরাকানে জনশ্রুতি আছে হযরত আলীর (রা) ছেলে মুহাম্মদ হানিফা এজিদের সাথে পরাজিত হয়ে আরাকানে আসেন এবং ইসলাম প্রচার

করেন।[১] কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর ইতিহাসে মুহাম্মদ হানিফার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কিছু জানা যায় না। অপরপক্ষে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত তৎকালীন সময়ের পূর্ব হতেই আরব বণিকদের যোগাযোগ থাকার প্রমাণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি রয়েছে।

কক্সবাজার জেলায় বসবাসকারী জনগণ সাধারণত নিজেদের আরব বংশোদ্ভুত বলে মনে করে থাকেন। এই এলাকার জনগণের ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে না সূচক শব্দ ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল বলে পন্ডিতগণের ধারণা।[২] কক্সবাজারের জনগণের ভাষায় প্রচুর আরবী ও ফার্সী শব্দ এবং মঘী শব্দের আধিক্য দেখা যায়। মঘী জরিপের অনুরূপ অত্র এলাকার জমির পরিমাপ দোন, কানী ও গন্ডা ইত্যাদি হিসাবে হয়ে থাকে। অপরপক্ষে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে গৌড়ীয় পরিমাপ অনুসারে বিঘা, কাঠা ও পাখী হিসাবে হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে কক্সবাজারের জনগণের উপর এটি রোসাঙ্গ সভ্যতার প্রভাবের ফল। অনেক ডাচ ও পর্তুগীজ শব্দও জনগণের ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। আরও দেখা যায় পর্তুগীজ নাম ফারনানডেজ বিকৃত হয়ে পরান মিয়া, ম্যানুয়েল বিকৃত হয়ে মনু মিয়া হয়েছে।

অনেক ডাচ পর্তুগীজ সন্তান ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে- এমন ঘটনা নিয়ে একটি গল্প ডাচ ইতিহাসে পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো, আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশের রাজত্বকালে কোন বিদেশী ইচ্ছা করলে আরাকানী রমণীদের বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু আরাকান থেকে চলে যাওয়ার সময় আরাকানী স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে যেতে পারতো না। This prohibition often constituted a serious hardship in individual cases and we find Europeans resorting to all sorts of expedients to smuggle their families out of the country. There were cases of wives being hidden in large martaban jars and Smuggled on board ship. The Pious Dutch Calvinists were also not a little worried because their children left in Arakan were brought up to be Muslims.[৩]

অর্থাৎ আরাকানে অবস্থানরত ডাচগণের ফেলে যাওয়া সন্তান সন্ততি মুসলমান হয়ে যায় বিধায় চলে যাওয়ার সময় বড় বড় মটকায় স্ত্রী-পুত্রদের লুকিয়ে আরাকান থেকে নিয়ে যেত। এ ঘটনাটি নিঃসন্দেহে তদানিন্তন আরাকানের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান কেমন ছিল তা জানতে আমাদের

সাহায্য করে। অর্থাৎ ইসলামই ছিল তৎকালীন আরাকানের সমাজ জীবনে মূল প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। মহাকবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্যে রোসাঙ্গের জনগোষ্ঠীর একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেনঃ "নানাদেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ আইসন্ত নৃপ ছায়াতলে। আরবী, মিশরী, সামী, তুর্কী, হাবসী ও রুমী, খোরাসানী, উজবেগী সকল। লাহোরী, মুলতানী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, দক্ষিণী, হিন্দি, কামরুপী আর বঙ্গদেশী। বহু শেখ, সৈয়দজাদা, মোগল, পাঠান যুদ্ধা রাজপুত হিন্দু নানাজাতি।" (পদ্মাবতী ঃ আলাওল)

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রোহিঙ্গারাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ রোসাঙ্গ সভ্যতার ধারক বাহক। তবে এটুকু বলা চলে, নানা জাতির সংমিশ্রনে গড়ে উঠেছে এই রোহিঙ্গা জাতি।

আরাকান সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মানুষের স্মরণীয় কালের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের উপকূলীয় ভূ-ভাগ ভূ-কম্পনজনিত কারণে এক বিরাট পরিবর্তনের শিকার হয়েছে। ১৫৫৪ খৃঃ রচিত তুর্কীদের ভারতীয় উপকূলের নৌ-চলাচলের উপর 'মুহিত' শীর্ষক একটি নিবন্ধে চট্টগ্রাম উপকূলের অনেকগুলো দ্বীপের কারণে সমুদ্র যাতায়াতের সংকট সম্পর্কে একটি সাবধানী বাণীর বর্ণনা করা হয়েছে। নিবন্ধে চট্টগ্রামের উপকূলের দ্বীপসমূহ সমুদ্রতলদেশ হতে ৯ ফুট উঁচু এবং আরাকানের চেদুবা (CHEDUBA) এলাকার দ্বীপসমূহ সমুদ্রতল হতে ২২ ফুট উঁচু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৭৬২ খৃঃ ২রা এপ্রিলের মারাত্মক ভূমিকম্পে শুধু চট্টগ্রাম উপকূলের ষাট বর্গমাইল দ্বীপ এলাকা স্থায়ীভাবে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।[৪১] স্মরণ করা যেতে পারে, চট্টগ্রাম থেকে আরাকান উপকূলবর্তী এলাকায় আরবীয় মুসলমানেরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিল বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের শাসকের নাম ছিল 'সুলতান' যা আরাকানী ভাষায় বিকৃত হয়ে 'সুরতন' হয়েছে। আরাকানের রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজাতুয়ে'তে উল্লেখ আছে ৯৫৩ খৃঃ আরাকানের রাজা 'সুরতন' বিজয় করে এক বিজয় স্তম্ভে লিখে দেন চেত্তা গৌং। যার অর্থ যুদ্ধ করা উচিত নয়। চট্টগ্রাম শব্দটি চেত্তা গৌং শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন।[৪২] এ ঘটনা থেকে এও মনে করা যেতে পারে যে,

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী 'সেই' মুসলিম রাজ্যটি সমুদ্রের তলদেশে হারিয়ে গেছে।

অনেকটা কৌতুহলের প্রয়োজনে আরও একটি ক্ষুদ্র গল্প এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। কক্সবাজারের জনগণের মুখে মাঝে মাঝে বাগধারার মতো একটি শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বাগধারাটি বিদ্রূপাত্মক ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাগধারাটি হলো বার শহরের তামাসা। আঞ্চলিক ভাষায় "বার শ' রর বাজী।"

সর্বপ্রথম পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী ইতিহাস প্রসিদ্ধ ম্যাগিলনের পর্তুগীজ সফরসঙ্গী দুয়ার্তে বারবোসা ১৫০১ খৃঃ থেকে ১৫১৬ খৃঃ পর্যন্ত ভারত সফর করেন। এ সময় তিনি চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেছেন। দুয়ার্তে বারবোসা তার বিবরণে আরাকানকে রোছানগো বলে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ আরাকানের রাজার বারটি প্রধান শহর ছিল। বারটি শহর বারজন গভর্নর দ্বারা শাসিত হতো। প্রত্যেক গভর্নর প্রতি বছরের কোন সময়ে নিজ নিজ এলাকা থেকে বার বছর পূর্ণ হয়েছে এরূপ বারজন কুমারী মেয়ে সংগ্রহ করে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত করে রাজার কাছে নিয়ে যেতো। কুমারীদের খুবই পাতলা একটি সাদা পোষাক পরানো হতো। কাপড়ের উপর মেয়েটির নাম লিখে রাখা হতো। খুব ভোরে সব দ্বাদশী কুমারীদের কোন এক খোলা ময়দানে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হতো এবং এ সময় পর্যন্ত তাদের কিছুই খেতে দেয়া হতো না। দুপুর পর্যন্ত সূর্যের প্রখর তাপে কুমারীরা ঘর্মাক্ত হলে পর পরিধানের কাপড় সম্পূর্ণ ভিজে যেতো। অতঃপর ঘর্মস্নাত কাপড়সমূহ খুলে রাজার কাছে নিয়ে যেতো, যেখানে সভাসদ সমেত রাজা অপেক্ষা করতো। একটার পর একটা কাপড় রাজা ও সভাসদরা নাকে লাগিয়ে ঘ্রান নিতো। যে কাপড়ের ঘাম রাজার কাছে সুঘ্রান লাগতো সেই সমস্ত মেয়েদের রাজা নিজের জন্যে রেখে দিত।[৪] হয়তোবা এ ঘটনাটি "বার শ' রর বাজী" হয়ে এখনো জনগণের কাছে বিধৃত রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের মগ-পর্তুগীজ জলদস্যু

সুদীর্ঘকালের রোসাঙ্গ সভ্যতার একটি কালো দিকও রয়েছে। সেটি হলো, পর্তুগীজ ও মগদের জলদস্যুবৃত্তি। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হতেই

পর্তুগীজ দস্যুরা বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় আগমন করে। সময়টা আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশের উত্থানকাল। মোগল শক্তির কাছে গৌড়ের পতন হয়েছে। মোগলদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে আরাকানের রাজাগণ অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখতো। বাংলাদেশের সাথে আরাকানের তখন সমুদ্রপথ ছাড়া আর কোন যোগাযোগের পথ ছিল না। উল্লেখ্য, পর্তুগীজরা যেমন ছিল জলদস্যু, তেমনি তারা ছিল তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ নৌযোদ্ধা ও নাবিক। 'but they had (Portuguess) one extradordinary and unique characterstics, they were mariners, supreme seamen.'[৪৪]

সম্ভাব্য মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আরাকানের রাজা জেবুক শাহ (মঘী নাম মিনবিনঃ ১৫৩১-১৫৫৩ খৃঃ) পর্তুগীজদের প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে আরাকানীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেন। স্থানীয় মগদেরকেই জেবুক শাহ অধিক পরিমাণে নৌ-বাহিনীতে ভর্তি করান। এর পেছনে সম্ভবত দু'টি কারণ ছিল। প্রথমতঃ আরাকানের সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। হয়তোবা প্রতিরক্ষা বিভাগের মুসলিম প্রাধান্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে নৌ-বাহিনীতে মগদের প্রাধান্য দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজ নৌ-দস্যুদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার মতো মানসিকতা হয়তোবা সুসভ্য মুসলমানদের ছিল না। অথবা স্বধর্মী মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের চেয়ে মগ সম্প্রদায় আরাকান রাজার কাছে বেশী কাঙ্খিত ছিল।

যাহোক, পর্তুগীজ দস্যুদের সাথে মিশে মগেরাও জলদস্যুতে পরিণত হয়। চট্টগ্রামের দিয়াঙ্গা ও সন্দ্বীপ মগ- পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডাতে পরিণত হয়। মেঘনা নদীর মোহনা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল মগপর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে জনশূন্য হয়ে ওঠে। এককালে বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও খুলনা জেলা ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল। গৌড়ের শাসকেরা এই সমস্ত অঞ্চল হতে প্রচুর রাজস্ব আদায় করতো। মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে এই সমস্ত এলাকা প্রায় জনবসতিহীন হয়ে পড়ে এবং গভীর জঙ্গলে পূর্ণ হয়।[৪৫] এমনকি দস্যুরা পশুপাখিকে পর্যন্ত নিধন করে নিঃশেষ করে দেয়। জলদস্যুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক ভান লিন ছোটেন (Van Lin Choten) বলেছেন, এরা বন্য জন্তুর মতো বর্বর, উম্মাদ, অশিক্ষিত ঘোড়ার মত দুর্দান্ত, ন্যায় নীতি বলে কোন কিছুর এরা ধার ধারে না।[৪৬]

সমকালীন ঐতিহাসিক শিহাব উদ্দিন তালিশ মগদস্যুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "মেঘনা নদীর মোহনা থেকে অববাহিকার উর্ধ্বদেশে প্রবেশ করে মগ দস্যুরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দিত। গৃহপালিত পশুরাও এদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেত না। গ্রামবাসী নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে লোকজনদের ধরে দস্যুরা একখানে জড়ো করতো। অতঃপর গরম লোহার শিক দিয়ে দস্যুরা তাদের হাতের তালু ছিদ্র করতো। তারপর চিকন বেত ছিদ্রপথে চালিয়ে দিয়ে বেধে ফেলতো। বেতের অপর মাথা ধরে সবাইকে জাহাজের কাছে নিয়ে গিয়ে পাটাতনে ফেলে রাখতো। মুরগীকে যেভাবে সিদ্ধহীন চাল ছিটিয়ে দেয় তদ্রূপ বন্দীদের উপর চাল সকাল বিকাল জাহাজের ছিদ্রপথে ছিটিয়ে দিত। এহেন অত্যাচারের পর যেসব লোক বাঁচতো তাদেরকে আরাকানে নিয়ে গিয়ে কৃষিকাজে নিয়োগ করতো। অনেককে দাস হিসেবে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দিতো। এমনকি অনেক সৈয়দ বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদেরও এমন অবমাননাকর জীবন যাপন করতে হয়েছে।"[৫২] ১৬০৭ খৃঃ জনৈক মোগল সেনাপতি ফতেখাঁ মগ পর্তুগীজ দস্যুদের পরাজিত করে সন্দীপ অধিকার করে নেন। অতঃপর ১৬০৯ খৃঃ দক্ষিণ শাহবাজপুর নামক স্থানে দস্যুদের সাথে এক যুদ্ধে ফতে খান নিহত হন। অবশেষে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা ও বিচক্ষণ সেনাপতি এবং বাংলার নবাব শায়েস্তা খান ১৬৬৬ খৃঃ জলদস্যুদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে চট্টগ্রাম দখল করে নেন।

শাহসুজার আরাকান গমণ ও আরাকান রাজশক্তির পতন

১৬৬০ খৃঃ শাহসূজা নিজ ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের হাতে পরাজিত হলে পর শাহসূজা সপরিবারে এবং একদল অনুচর বাহিনী নিয়ে আরাকান পালিয়ে যান। আরাকানের তৎকালীন সময়ের রাজার নাম সান্দা-থু ধর্ম্মা, রাজত্বকাল ১৬৫২-১৬৮৪খৃঃ। আরাকানের রাজা চন্দ্র-সু-ধর্ম্মা বা সান্দা-থু-ধর্ম্মা শাহসূজার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল একটি বড় নৌ জাহাজ দিয়ে শাহসূজাকে সাহায্য করবেন, যেন তিনি শেষ জীবন পবিত্র মক্কায় যাপন করতে পারেন। প্রতিজ্ঞানুসারে শাহসুজা আরাকানের রাজধানী ম্রোহং পৌছলে পর রাজকীয় সম্মান দেখিয়ে আরাকান রাজা তাকে গ্রহণ করেন এবং লেম্রো নদীর তীরে শাহসূজাকে একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন।[৫৩] কিন্তু শাহ সূজার মূল্যবান সম্পদ ও অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আমেনাকে দেখে চন্দ্র-সু-ধর্মা পাগল হয়ে ওঠেন। মহাকবি

আলাওল তখন রোসাঙ্গের কবি। আলাওলের বিবরণ অনুযায়ী রাজা চন্দ্র-সু ধর্ম্মার অভিভাবক ও প্রধানমন্ত্রী ছিদ্দিক বংশজাত কোরেশী মাগন ঠাকুর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। রোসাঙ্গ দেশের মুসলমানদের প্রধান নব রাজ মজলিশ তখন নতুন প্রধানমন্ত্রী। রণকৌশলী সৈয়দ মুসা ছিলেন সৈন্যমন্ত্রী। মুখ্য সেনাপতি ছিলেন সৈয়দ মুহম্মদ। অপর এক মন্ত্রীর নাম ছিল শ্রীমন্ত সোলাইমান। প্রধান বিচারপতি ছিলেন কাদেরিয়া খেলাফতের পীর সুফী মাসুম শাহ।

যাহোক, রাজা চন্দ্র-সু-ধর্ম্মা রাজকুমারী আমেনাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালে মোগল বংশীয় শাহসূজা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে শাহসূজার সাথে চন্দ্র-সু-ধর্ম্মার মধ্যে যুদ্ধে শাহসূজা পরাজিত হয় ও শাহসুজাকে হত্যা করা হয়। রোসাঙ্গে মুসলমানরা যদি শাহসূজার পক্ষাবলম্বন করতো নিঃসন্দেহে আরাকানের ইতিহাস তখন ভিন্নতর হতো। এরা আরাকানের রাজার অধিক অনুগত ছিল। পরবর্তীতে এজন্যে রোসাঙ্গের মুসলমানদের অনেক খেসারত দিতে হয়েছে।

শাহসূজার বিয়োগান্তক ঘটনাকে নিয়ে সৃষ্টি হয় রাজা ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত। এক পর্যায়ে মুসলমানেরা রাজপ্রসাদ জ্বালিয়ে দেয়। রাজ্যে নেমে আসে চরম অরাজকতা। শাহসূজার করুণ মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছলে পর সারা ভারত জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। বঙ্গদেশ ও ভারত থেকে দলে দলে লোক গিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে আরাকানে গিয়ে ভিড় করতে থাকে। উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে রোসাঙ্গের মুসলমানদের। খোলা তরবারী ও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে রোসাঙ্গের মুসলমানেরা একে একে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে থাকে আরাকানকে। তাদের ইচ্ছায় একজন রাজা হয় এবং তাদের ইচ্ছায় সে রাজাকে হত্যা করে অপর একজন রাজাকে ক্ষমতায় বসানো হয়। এই সমস্ত ক্ষিপ্ত মুসলমানদের মধ্যে কোন শক্তিধর ব্যক্তি যদি এদেরকে একত্রিত করে নিজেই ক্ষমতায় বসতে পারতেন তবে আরাকানের ইতিহাস ভিন্নতর হতো।

যাহোক, অবশেষে ১৭১০ খৃঃ সান্দা উইজা নামক জনৈক শক্তিধর সামন্ত (১৭১০-১৭৩১ খৃঃ) মুসলমানদের নিরস্ত্র করে আরাকানে বসবাস করান। অস্ত্র ছেড়ে মুসলমানেরা হয়ে পড়লো কৃষিজীবী।

হয়তো আওরঙ্গজেব ভ্রাতা শাহসূজাকে হাতের কাছে পেলে হত্যা করতেন। কিন্তু নিজ ভ্রাতার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর তাকেও বিচলিত করে তোলে। প্রতিশোধ গ্রহণার্থে মামা শায়েস্তা খানকে নির্দেশ দিলেন চট্টগ্রাম দখল করার জন্য। ১৬৬৬ খৃঃ শায়েস্তা খানের বিচক্ষণ সেনাপতিত্বে চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে মোগলদের পদানত হয়। শায়েস্ত খানের পুত্র বুর্জগ উমেদ খান মগদস্যুদের তাড়াতে গিয়ে রামু পর্যন্ত দখল করে নেন। ১৬০৭ খৃঃ সন্দ্বীপ বিজয়ী মোগল সেনাপতি শহীদ ফতে খানের নাম অনুসারে রামুর মোগলবাহিনীর শেষ সীমান্ত ফতে খাঁর কুল হিসাবে এখনো পরিচিত। আলমগীরনামায় রামুকে রামব্রো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোগল বাহিনী রামু দখল করে জলদস্যুদের ধৃত সকল বাঙালিদের মুক্ত করে দেন।[২২] আলমগীরনামায় উল্লেখ রয়েছে, মোগলদের চট্টগ্রাম থেকে রামু পর্যন্ত পৌঁছতে বার দিন সময় লেগেছিল। পথের দুর্গমতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, পাহাড়ীপথ অসংখ্য পাহাড়ীয়া নদী আর ঘন জঙ্গল পরিপূর্ণ যে, একটা সাপের পক্ষেও পথ চলা খুবই কষ্টকর।[২৩] পূর্বেই বলা হয়েছে চট্টগ্রামের সাথে দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল সমুদ্রপথ। মোগল সৈন্যরা বেশিদিন রামুতে অবস্থান করেনি। বর্ষাকাল আসার পূর্বেই চট্টগ্রাম ফিরে যায়।

দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও আরাকান

ইতিহাসে দেখা যায়, রামু এবং চকরিয়ায় অনেক পূর্ব থেকে জনবসতির অস্তিত্ব ছিল। মনে হয় রামু থেকে চকরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হতো। তবে এটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। অধিকাংশ সময় এ রাজ্যটি আরাকান রাজার অধীন ছিল। ত্রিপুরার রাজ বংশের ইতিহাস রাজমালা'তে দেখা যায়, ১৫১৩ খৃঃ ত্রিপুরার রাজা ধনমানিক্য (১৪৯০-১৫২৬ খৃঃ) রামু পর্যন্ত অধিকার করে নেন। রাজমালা মতে, রামু আদি ছয় সীক মারিয়া লইল। রোসাঙ্গ নিকটে যাইয়া পুষ্কুরিনি দিল।

অতএব দেখা যায়, এ এলাকা মাঝে মাঝে ত্রিপুরা রাজার অধীন ছিল। অন্যত্র দেখা যায়, ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ALFONSODEMELLO নামক জনৈক পর্তুগীজ নাবিক সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের উপকূলে আসে। চকরিয়ার নিকট আসলে পর জাহাজটি কোন দ্বীপে আঘাত খেয়ে ভেঙ্গে যায়। চকরিয়ার উপকূলের জেলেগণ পর্তুগীজ আরোহীদের দেবতার উদ্দেশ্যে বলী দেয়ার জন্যে বন্দী

করে। পরে খাজা শাহাবুদ্দিন নামক জনৈক পারস্য-সওদাগরের সহযোগিতায় পর্তুগীজগণ মুক্তি পায়।[১১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, চকরিয়া থেকে রামু পর্যন্ত এলাকায় একটি আলাদা রাজ্য ছিল। ত্রিপুরার ইতিহাস, রাজমালাতে দেখা যায়, আদম শাহ নামে এক সামন্ত আরাকান রাজার অধীনে থেকে এই অঞ্চল শাসন করতো। ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য (১৫৭৭-১৫৮৬ খৃঃ) চট্টগ্রাম আক্রমণ করলে পর আদম শাহ আরাকান রাজার পক্ষ ত্যাগ করে অমর মানিক্যের পক্ষাবলম্বন করেন। পরবর্তীতে আরাকান রাজা ও অমর মানিক্যের মধ্যে নিম্নরূপ পত্রালাপ হয়ঃ মঘ রাজা সেকান্দার রণাঙ্গেতে গেল। অমর মানিক্য স্থানে পত্র যে লিখিল। আদম শাহ রাজাকে পাঠাও ত্বরিত। তবে তোমা সাথে আমার হবে বহু প্রীত।। সেকান্দর শাহ স্থানে নৃপ লিখে পুনি, শরাণাগত আদম সাহা না দিব কখনি (রাজমালা)।[১৬] অর্থাৎ আরাকানের রাজা সেকান্দার শাহ ত্রিপুরার রাজাকে পত্রযোগে পলাতক আদম সাহাকে পাঠাতে বললে, ত্রিপুরা রাজা উত্তরে জানিয়ে দেয় যে, আশ্রিত আদম সাহাকে ফেরত দেয়া হবে না।

দক্ষিণ চট্টগ্রামে চাকমা জাতি :

১৫৫০ খৃষ্টাব্দে Joao De BARROS নামে জনৈক পর্তুগীজের আঁকা একটি মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্বে এবং আরাকানের উত্তরে দু'টি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে CHACOMAS নামক একটি রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে।[১৭] যাহোক, রামুতে চাকমার কুল নামক একটি স্থান রয়েছে। এ থেকে চাকমারা কোন সময় রামু চকরিয়া অঞ্চলে অবস্থান করতো বলে মনে হয়। ১৬০৭ খৃঃ আরাকানের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাজা সেলিম শাহ (মঘী নাম রাজাগ্রীঃ ১৫৯৩-১৬১২খৃঃ) জনৈক PHILIP DE BRITO NICOTE পর্তুগীজের কাছে লেখা এক চিঠিতে নিজেকে The highest and the most powerful king of Arakan, of chocomas and of Bengal' বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১৮] অতএব আরাকান রাজার অধীন কোন এক স্থানে চাকমাদের রাজ্য হয়তবা ছিল এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের কোন এক স্থানে চাকমাদের রাজ্য থাকা যুক্তিসঙ্গত। আবার ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল বার্মার রাজার আরাকান দখলের পর, তুরবুয়ামা নামক বার্মার জনৈক রাজা চট্টগ্রামের ইংরেজ কমিশনারের কাছে যে চিঠি লেখেন, তাতে আরাকানে বসবাসকারী চাকমারা সীমান্তের জঙ্গলে পালিয়ে গেছে বলে উল্লেখ রয়েছে। মূল

চিঠিটি ফার্সীতে লেখা। উল্লেখ্য, আরাকানের প্রশাসনিক ভাষা ফার্সী ছিল। ১৭৮৪ খৃঃ আরাকান বার্মা কর্তৃক দখল করে নেয়ার পরও প্রশাসনিক ভাষা ফার্সী ছিল। ১৮২৩-২৪ খৃঃ এংলো-বার্মা যুদ্ধের পর আরাকানসহ গোটা বার্মা বৃটিশদের দখলে আসার পর ফার্সীর স্থলে ইংরেজীকে প্রশাসনের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উপরোক্ত চিঠি থেকে বুঝা যায়, বর্তমান আরাকানেই চাকমাদের বাসবাস ছিল। অতএব এ নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের ধারণা। এখানে গভীরভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে চাকমা ভাষার মিল অত্যন্ত বেশি।

টেকনাফ সর্বশেষ সীমানা হলো কি করে

এখানে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। টেকনাফের নাফ নদী কখন থেকে কক্সবাজার জেলা ও আরাকানের সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তা, এখনো আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ভাবিয়ে তুলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেও দেখা যায়, টেকনাফ বৃটিশ শাসিত চট্টগ্রামের সর্বশেষ সীমান্ত।

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে হবে তৎকালীন আমলের কক্সবাজার জেলার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে। পূর্বেই বলা হয়েছে মোগল বাহিনী রামু পর্যন্ত এসেছিল এবং রামুর মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের শক্তিশালী আস্তানা ধ্বংস করে অনেক বাঙালি বন্দীদের মুক্ত করেছিল। মোগল বাহিনীর অভিযানকালে চট্টগ্রাম থেকে রামু পর্যন্ত স্থল পথের দুর্গমতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, ১৬৬৬ খৃঃ পর্যন্ত রামু ও চকরিয়ার কিছু অংশ ছাড়া এই অঞ্চলে কোন জনবসতি গড়ে উঠেনি। মোগল অভিযানের পরবর্তীকালেও জনবসতি গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। কেননা, শাহসুজার আরাকান গমনের পর সে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং রাজনৈতিক শৃংখলা আর ফিরে আসেনি। আর এ কারণে রামু থেকে চকরিয়া পর্যন্ত রাজ্যটির উপর আরাকান রাজার কোন রকম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার শক্তি ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে, গোলযোগপূর্ণ মুহূর্তে অনেক রাজা মাত্র একদিনের জন্যে আরাকানে রাজত্ব করেছে। অনুরূপ অস্থিতিশীলতা ছিল মোগল সম্রাজ্যে। এমনকি তৎকালীন সময়ে এই স্থানটির পক্ষে স্বাধীন থাকারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায়

না। কেননা, যদি তাই হতো তবে ইংরেজদের চট্টগ্রাম দখল করার পর এই স্থানে কিছু না কিছু সংঘাত ইংরেজদের সাথে হতো।

সম্ভবত তখন রামু চকরিয়া পর্যন্ত অঞ্চল চট্টগ্রামের প্রশাসকের নির্দেশে চলতো। ফলে চট্টগ্রাম ইংরেজের হাতে চলে গেলে রামু পর্যন্ত এলাকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলভুক্ত হয়ে পড়ে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক বিচার করলে দেখা যায়, চট্টগ্রাম কিংবা আরাকানের সাথে রামু চকরিয়া অঞ্চলের একমাত্র যোগাযোগ ছিল সমুদ্র পথে। বর্তমান টেকনাফ, কক্সবাজার ও উখিয়া প্রভৃতি এলাকা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ পাহাড়ের রেখা দেখে প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতিই টেকনাফকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সীমান্তে পরিণত করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, ১৮১১ খৃঃ লেখা জনৈক বৃটিশ বাহিনীর অফিসারের বিবরণ থেকে। অফিসারটির বর্ণনা অনুসারে, "রামু থেকে টেকনাফ পর্যন্ত স্থলপথে একমাত্র যোগাযোগ বঙ্গোপসাগরের বেলাভুমি। পথের দূরত্ব একশত চল্লিশ মাইল। রামুর পরে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। সাগরের বেলাভূমির উপর দিয়ে পথ চলা অত্যাধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ছোট ছোট অসংখ্য নদী পাহাড় থেকে এসে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এর অল্প কিছু আমরা ভেলা তৈরি করে অতিক্রম করেছি আর বাকি নদী অতিক্রম করার জন্য ভাটার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সারা পথব্যাপী খাওয়ার পানির বড় অভাব। পাহাড় থেকে আসা ঝরণা থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়, আর এই পানি ছিল স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক। অসংখ্য বন্য মহিষ, বন্য হাতি প্রতি মুহূর্তে আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে দেয়।" বিবরণে আরও উল্লেখ আছে গভীর জঙ্গলে আবৃত গগনচুম্বি পাহাড়ের সারি চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যে একটি স্থায়ী ও প্রকৃতিক সীমান্ত তৈরি করেছে।[১০]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে, প্রকৃতিই টেকনাফের নাফ নদীকে আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিল। যে শাসক রামু পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রাকৃতিক কারণেই তার সীমানা টেকনাফ পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

আরাকানীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্মার রাজা ভোদাপায়া আরাকান আক্রমণ করে দখল করে নিলে কয়েক হাজার আরাকানী পালিয়ে সীমান্তবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেয়।

আরাকানীরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অতর্কিত বর্মী বাহিনীর উপর হামলা চালাতে শুরু করে। বিদ্রোহী আরাকানীদের আশ্রয়স্থল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন থাকায়, বার্মার রাজা এদের মূল নেতাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্যে কোম্পানি সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। নতুবা কোম্পানির এলাকা বর্মী বাহিনী আক্রমণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। এক পর্যায়ে ধূর্ত বৃটিশ ছলচাতুরির সাহায্যে তিন জন বিদ্রোহী নেতাদের বন্দী করে বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করে। বর্মী বাহিনী বন্দীদের চোখ উপড়িয়ে ফেলে এবং জলন্ত আগুনে জীবন্ত নিক্ষেপ করে মেরে ফেলে। বৃটিশদের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণকে সারা ভারত বর্বরতা বলে অভিহিত করে।

জনৈক বিদ্রোহী নেতা ঘা-থানভির মৃত্যুর পর তার ছেলে সিনপিয়া (বৃটিশদের কাছে KING BERING) মগ বিদ্রোহীদের আরও অধিকভাবে সুসংগঠিত করে একটি শক্তিশালী বিদ্রোহী দল গঠন করে আরাকানের বর্মী বাহিনীদের বিপর্যস্ত করে তুলে। দিন দিন বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে আরাকানীরা পালিয়ে এসে সিনপিয়ার বিদ্রোহী বাহিনীকে আরও জোরদার করে তুলে। এক পর্যায়ে সিনপিয়া রাজধানী ম্রোহং ছাড়া সমগ্র আরাকান দখল করে নেয়। এ মুহূর্তে সিনপিয়ার সেনাবাহিনীতে গোলাবারুদের তীব্র সংকট দেখা দেয়। যে কোন শর্তে সিনপিয়া গোলাবারুদ ও রসদ সরবরাহ করার জন্যে বৃটিশদের কাছে আবেদন জানায়। সিনপিয়া তার আবেদনে গৌড়ের সোলতানের সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু সিনপিয়ার কোন মানবিক আবেদন ধূর্ত অধিপত্যবাদী বৃটিশদের মন গলাতে পারেনি। অবশেষে নতুনভাবে বর্মী বাহিনী এসে পড়লে বাঁশের তৈরি বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করতে করতেই স্বাধীনতা যুদ্ধের অনন্য বীর সিনপিয়া পরাজয় বরণ করে।

যাহোক, ১৭৯৮ খৃঃ মাত্র তের বছরের মধ্যে আরাকানের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী পালিয়ে এসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সীমানার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। বলাবহুল্য সিনপিয়ার বিদ্রোহী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে বার্মার সাথে কোম্পানি সরকারের সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে। যদিও কোম্পানির সরকার বিদ্রোহ দমন কিংবা শরণার্থীদের বাধা দেয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তথাপি বার্মার সরকারের কাছে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ ও সুসম্পর্ক রক্ষা করার খাতিরে কোম্পানির পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স বিশেষ দূত হিসেবে বার্মার রাজধানী আভাতে কাজ করতে থাকে। ১৭৯৮খৃঃ এতো অত্যাধিক সংখ্যক

আরাকানী পালিয়ে আসে যে এ অঞ্চলে এক মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র দৈনিক শিশুর মৃত্যুর হার বিশজন বলে এক রিপোর্টে উল্লেখ আছে। নাফ নদীর পানি আরাকানীদের মৃত দেহে ভরে ওঠে।

কক্সবাজার এর নামকরণ

কিছুটা মানবিক কারণ এবং প্রধানত সর্বদক্ষিণের পতিত পাহাড়ী অঞ্চলকে আবাদ করার জন্যে আরাকান থেকে আগত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্যে ১৭৯৮ খৃঃ মতান্তরে ১৭৯৯ খৃঃ জুন মাসে ক্যাপটেন হিরাম কক্সকে আভা থেকে এনে পাঠানো হয় এই অঞ্চলে। পুনর্বাসনের জন্যে প্রধান স্থানটি নির্বাচন করা হয় কক্সবাজার নামক স্থানে, যে স্থানটির নামকরণ হয় ক্যাপটেন হিরাম কক্স-এর নামানুসারে। কক্সবাজারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থান করে বছর শেষ হওয়ার আগেই ক্যাপটেন হিরাম কক্স মৃত্যুবরণ করেন। এরপর শরণার্থীদের পুনর্বাসনের তদারক করার জন্য ঢাকার রেজিস্টার মিঃ কারকে পাঠানো হয়। মিঃ কার-এর তদারকীতে রামু হতে উখিয়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

হয়তো দুটি কারণে কক্স সাহেব পুনর্বাসনের জন্য বর্তমান স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন। বর্তমান কক্সবাজারের কাছারী পাহাড় নামক স্থানটি এক কালের মগ জলদস্যুদের তৈরি বন্দী শিবির বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। অনেকেই মনে করেন মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা এখানে বসেই দুরপাল্লার ব্যবসায়ী জাহাজ লুট করত। অতএব মগদস্যুরা বন্দীদের দিয়ে আগে থেকেই কিছু কিছু জায়গা পরিষ্কার করে বসবাসের জন্য উপযোগী করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। তাছাড়া এর পাশেই 'বদর মোকাম'। যদিও বদর মোকামের অস্তিত্ব কিভাবে ছিল এখনো জানা যায়নি। তবে কস্তরাঘাটের পার্শ্বস্থ মসজিদটি 'বদর মোকাম' মসজিদ বলে খ্যাত ও পরিচিত। অনুরূপ টেকনাফের পশ্চিম উপকূলে আর একটি 'বদর মোকাম' রয়েছে। আরাকানের আকিয়াবেও একটি 'বদর মোকাম' দেখা যায়। এমনকি মালয়েশিয়া পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূলে অনেক 'বদর মোকাম' আছে বলে জানা যায়।

নিঃসন্দেহে এই সমস্ত বদর মোকামসমূহ চট্টগ্রামের পীর বদর আউলিয়ার স্মৃতি বহন করে থাকে। জানা যায়, সমুদ্র পথেই পীর বদর আউলিয়া সব সময় চলাফেরা করতেন। অতএব কক্সবাজারের বদর মোকামেও পীর বদর

আউলিয়ার হয়তবা কোন অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত এই দুই নিদর্শনের কারণেই কক্স সাহেব বর্তমান স্থানটি নির্বাচন করেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্যে [সংকলনঃ কক্সবাজারের ইতিহাস, কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ১৯৯০- ইতিহাস, ডঃ আবদুল করিম]

কক্সবাজারের জনবসতি

শুরুতেই আগামী দিনের গবেষকের সুবিধার্থে কক্সবাজারের জনগোষ্ঠীর উপর একটি সুচিন্তিত অভিমত তুলে ধরার প্রয়াস নিতে চাই। তবে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন আছে।

১৭৮৪ খৃঃ বার্মার রাজা আরাকান দখল করে নিলে পর আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগরা পালিয়ে আসে। ইহাই যুক্তিসঙ্গত যে, বৌদ্ধদের সাথে সাথে মুসলমানরাও লাঞ্ছিত হতে থাকে। কোন স্থানে দুর্যোগ আসলে উক্ত এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেকে অনুরূপ অত্যাচারের শিকার হতে বাধ্য।

অতএব মগদের সাথে সাথে মুসলমানরাও পালিয়ে আসে। তবে তফাৎ হলো মগেরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় গভীর জঙ্গলে আর মুসলমানেরা সমুদ্র পথে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় স্বধর্মীয় চট্টগ্রামের মুসলমানদের কাছে। আরাকান থেকে আগত মুসলমান স্থানীয় মুসলমানদের কাছে এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং এখান থেকেই শুরু হয় অতীতের রোয়াই ও চাঁড়িগ্রাই (চট্টগ্রামী) দুই জনগোষ্ঠীর বিবাদের ইতিহাস। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রোঁয়াই শব্দটি রোসাঙ্গ হতে অভিন্ন। একই এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন দুই ধরনের ভাষা হতে পারে না। যেমন একজন উখিয়া থানায় বসবাসকারী লোককে একজন মহেশখালী থানায় বসবাসকারী লোক থেকে চেহারার কারণে পৃথক করে নেয়ার উপায় নেই। তবে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে লোকটির পূর্ব পুরুষ রোঁয়াই নাকি চাড়িগ্রাই (চট্টগ্রামী)।

আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, বাঁশখালী থানার কোন লোককে রাউজান থানার কোন লোক থেকে চেহারার জন্যে আলাদা করে নেয়া যাবে না। কিন্তু বাশখালীর চট্টগ্রামী কোন পল্লীর লোককে রোঁয়াই পল্লীর লোক থেকে ভাষার কারণে আলাদা করে নেয়া যাবে। উল্লেখ্য, মাত্র তিন দশক আগেই রোঁয়াই চট্টগ্রামী বিবাদের অস্তিত্ব ছিল। এ নিয়ে তৎকালীন সময়ে পত্রপত্রিকাও বহুবার সোচ্চার হয়েছে।

রোঁয়াইদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামীদের অভিযোগ ছিল, রোঁয়াইরা ভাসমান, রোঁয়াইরা রাজহত্যাকারী ইত্যাদি। অপরপক্ষে রোঁয়াইরা নিজেদের খাঁটি আরব বংশীয় দাবি করে চট্টগ্রামীদের চেয়ে অধিক কুলীন মনে করে। ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, এ সকল দাবীর পেছনে ঐতিহাসিক যুক্তি আছে।

অতএব কক্সবাজারে যখন আবাদী শুরু হলো তখন ভাসমান রোঁয়াইরা উত্তর দিক হতে অর্থনৈতিক কারণে কক্সবাজার এর জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমি আবাদ করে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং মাত্র দেড়শত বছরের মধ্যেই এরা কক্সবাজার জেলার প্রধান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

রোসাঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের বর্ণনায় আরাকানের ইতিহাস

ভাগ্যান্বেষী সেনাপতি বুরহানউদ্দিন খান

নসরউল্লাহ খান রোসাঙ্গের অন্যতম প্রতিভাবান বাঙালি কবি। অদ্যাবধি তার চারটি পুথিকাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'শরিয়তনামা' কবি নসরুল্লাহ খানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে তাঁর বংশ পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ

ধৈর্য্যবন্ত বীর্যবন্ত মর্য্যদার নাহি অন্ত নাম হামিদুদ্দীন মতির নাম।
গৌড়দেশ বাঙালা নাম বসে কযে অনুপাম সে বহুপাল উজীর প্রধান।।

তানপুত্র গুণবাণ অস্ত্রে শস্ত্রে পুজ্যমান জগে ঘোষে বুরহানুদ্দিন নাম।
দৈবগতি দেশ ছাড়ি ইষ্ট মিত্র সঙ্গে করি রোসাঙ্গ দেশেত কৈল্য ধাম।
তখন রোসাঙ্গ দেশে কিবা আদ্যে কিবা শেষে অশ্ব আছোয়ার ন আছিল।
হয় গজ বহু সঙ্গে দেখি তানে নৃপরঙ্গে লস্কর উজির তানে কৈল্য।।

ইব্রাহিম তানসুত রূপগুণে অদ্ভুত অশ্ববার কর্মবিচক্ষণ।
সুজাতউদ্দিন নাম অস্ত্রে শস্ত্রে অনুপাম নাম ধরে তাহান নন্দন।।"

'শরিয়তনামার' উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যায়, কবির অষ্টম পূর্ব পুরুষ হামিদুদ্দিন বাঙলার রাজধানী গৌড়ের প্রধান উজীর ছিলেন। তাঁর পুত্র বুরহানউদ্দিন কোন দৈব দুর্বিপাকে পড়ে ভাগ্যের অন্বেষণে বহু অনুচর ও পরিবার পরিজন নিয়ে রোসাঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। রোসাঙ্গে তখন অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না। রোসাঙ্গের রাজা বুরহানউদ্দিনের রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে রোসাঙ্গের লস্কর উজীর পদে নিয়োগ করেন। বুরহানউদ্দিনই সর্বপ্রথম রোসাঙ্গ রাজ্যে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তার পুত্র ইব্রাহীম এবং তৎপুত্র সুজাতউদ্দিনসহ অধঃস্তন পুরুষদের অনেকেই রোসাঙ্গের সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও গবেষক ডঃ আবদুল করিম ও ডঃ এনামুল হক কবি নসরুল্লাহ খানের 'শরিয়তনামার' রচনাকাল ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন। দেখা যায় বুরহানউদ্দিন কবি নসরুল্লাহ খানের সপ্তম পূর্ব পুরুষ। প্রতি প্রজন্মের গড় বয়স পঁচিশ বছর হিসাবে ধরে নেয়া হলে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে আনুমানিক ১৫৭৪ সালের দিকে বুরহানউদ্দিন বেঁচে ছিলেন। তখন আরাকানের রাজা ছিলেন সেকেন্দার শাহ। রাজত্বকাল ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস রাজমালাতে দেখা যায়, সেকান্দার শাহের রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজ অমর মানিক্যের সাথে আরাকানের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সিকান্দর শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেলিম শাহ ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে ম্রোহং-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বলা হয়ে থাকে, জেবুক শাহ এর আমলে ম্রাউক-উ-রাজবংশের যদি পরিপূর্ণ স্ফূরণ ঘটে তবে সেলিম শাহ সেই রাজবংশকে সুসংহত করেছেন।

বলাবাহুল্য, ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি সিন্ধী খানের নেতৃত্বাধীন পঞ্চাশ হাজার গৌড়ীয় সৈন্য বাহিনীর সহায়তায় যুবরাজ নরমিখলা মোহাম্মদ সোলাইমান শাহ নাম ধারণ করে আরাকানে ম্রাউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ম্রোহং বা পাথুরী কিল্লায় সিন্ধী খান মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্রাউক-উ বংশের রাজারা গৌড়ের ইলিয়াস শাহী রাজবংশকে কর প্রদান করতো। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ম্রাউক-উ বংশের রাজপুত্র জেবুক শাহ ম্রোহং-এর ক্ষমতা দখল করে বাংলার বৈশ্যতা অস্বীকার করে আরাকানের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে এই বংশের রাজা সেলিম শাহ আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করে বঙ্গদেশের ঢাকা-সুন্দরবন থেকে বার্মার মলমিন পর্যন্ত এক বিস্তৃত ভুভাগ আরাকান রাজ্যভুক্ত করেন এবং সেলিম শাহ নিজেকে বাদশাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। ফরাসী পরিব্রাজক ফাইয়ারড (Fyiard) এ সময় ভারত সফর করেন এবং তিনি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী আরাকানকে মোগলদের পর দ্বিতীয় শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে অভিহিত করেছেন।

যাহোক, কবি নসরুল্লাহ খানের পুর্ব-পুরুষ বুরহানউদ্দিন খান আরাকান রাজ সেকান্দর শাহ অথবা সেলিম শাহের লস্কর উজীর ছিলেন, তা বলা যেতে পারে। বুরহানউদ্দিনের পুত্র ইব্রাহীম ও তৎপুত্র সুজাতউদ্দিন সেলিম শাহের সৈন্যবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা

যায়। এ ঘটনা থেকে আরও বুঝা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশ হতে বহু লোক ভাগ্যান্বেষণে আরাকানে পাড়ি জমাত।

লস্কর উজির আশরাফ খান

ষষ্টদশ শতকের কবি দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য সৃষ্টি। কাব্যে মনোরম শব্দের ব্যবহার ও সরস কাহিনী বর্ণনায় মহাকবি দৌলত কাজী অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এযাবৎ তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি তার জীবদ্দশায় কাব্যগ্রন্থটি লেখার কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। তার মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পর মহাকবি আলাওল কাব্যের বাকী অংশ সম্পূর্ণ করেন।

'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যগ্রন্থটি ষষ্টদশ শতকে আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভায় মহামতি আশরাফ খানের অনুরোধে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। কাব্যের কোথাও কবি তাঁর আত্মপরিচয় তুলে ধরেন নি। তবে, তৎকালীন রোসাঙ্গের রাজনীতির কিছু অংশ ফুটে উঠেছে। রোসাঙ্গরাজের প্রশস্তি অংশে বলা হয়েছেঃ

রসূলের পদযুগ মস্তকেত ধরি। পীর গুরুজন পিতৃমাতৃ নমস্কারি।।
সুজন সকল পদেমোর পুষ্পাঞ্জলি। কহিনু প্রসঙ্গ কিছু রচিয়া পাঞ্চালি।।
কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী। রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি।।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রভাত-ভানু বিখ্যাত ভুবন। পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।
দেবগুরু পূজায় ধর্মেত তার মন। সে পদ দর্শনে হয় পাপের মোচন।।
পুণ্য ফলে দেখে যদি রাজার চরণ। নারকীহ স্বর্গ পায় সাফল্য জীবন।।
পঞ্চশত হস্তী যার বয় আদেশ। অরুণ যোগান কালা মাতঙ্গ বিশেষ।।
রাজ্য সব উপশম কৈল সুবিচার। কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার।।
ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান। হানাফি মোঝাব ধরে চিস্তি খান্দান।।
ইমান-রতন পালে প্রাণের ভিতর। ইসলামের অলঙ্কার শোভে কলেবর।।
পীরগুরু অভ্যাগত পূজেন্ত তৎপর। লোক উপকার কহে নাহি আপ্তপর।।
রাজনীতি লোকধর্ম বুঝন্ত সকল। মিত্রেরে সহায় করে অর রসাতল।।
মসজিদ পুষ্কর্নী দিলা বহুল বিধান। নানা দেশে গেল তান প্রতিষ্ঠা বাখান।।
সৈয়দ, কাজি, সেখ, মোল্লা, আলীম ফকির। পুজন্ত সে সবে যেন আপন শরীর।।

বিদেশী আরবী রুমী মোগল পাঠান। পালেন্ত সে সবে যেন শরীর সমান।।
শ্যাম তনু যুক্তিমন্ত বচন মিষ্টতা। শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা।।
দেশান্তরী প্রবাসী পন্থিক বাণিজার। দেশে দেশে কীর্তিযশ বাখান যাহার।।
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ। আচি কুচি মাচীন পাটনা আদি দেশ।।
মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধমন। তান হস্তে রাজনীতি কলাসমর্পণ।।
মহাদেবী অনেক ভাবিল সুনিশ্চিত। রাজপুত্র হস্তে অধিক সুপাত্র পন্ডিত।।
নৃপতিহ পুত্রভাবে হরিষে সাদরে। মহামাতা করিলেন আশরাফ খানেরে।।
সৈন্য সনে অভিষেক করিল রাজন। মহামাত করিলেক রাজ্যের ভাজন।।
মঙ্গল বিধানে সর্বকৈল্য সমর্পণ। বিবিধ প্রসাদ দিলা কল্যাণ কারণ।।
ছত্রসমে দিলা সৈন্য পতাকা দুমদুমি। স্বর্ণ অঙ্গরাগ আর বহুমূল্য জমি।।
দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া। রাজখড়গ সমর্পিলা লস্করি কাপড়া।।
সৈন্যপতি হৈলা নানা সৈন্য অধিপতি। আশরাফ নামে শোভা নাম হৈল অতি।।
শ্রী আশরাফ খান লস্কর উজির। যাহার প্রতাপ-বজ্রে চূর্ণ অরি শির।।
নৃপতির সম্পাশে বৈসেন্ত দিবারাতি। যথা যায় রাজা তথা চলেন্ত সঙ্গতি।।
একদিন ইচ্ছা হৈল সুধর্ম রাজার। সসৈন্য সমস্ত চলে বিপিন-বিহার।।
ধবল অরুণ কালা লাল বর্ণ গজ। আকাশ ছাইয়া চলে নানা বর্ণ ধ্বজ।।
অযুতে অযুতে সৈন্য অশ্ব নাহি সীমা। কনে বা বুঝিতে পারে নৌকার মহিমা।।
দ্বাদশ দিবস পন্থ নৌকায় চলিতে। কৌতুকে চলেন্ত রাজা নিকুঞ্জ খেলিতে।।
নানা বর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে। নব শশিগণ যেন জলে নামি ভাসে।।
দুই সারি সে নৌকা ভাসায় নানা রঙ্গে। আরোহিল নৃপসভা আশরাফ সঙ্গে।।
দশদিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়। সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায়।।
রজতের বৈঠা সব শোভন নৌকায়। জলসিঞ্চে স্বর্ণপাখি পক্ষ যেন রূপার।।
দেব সিংহাসনে যেন ইন্দ্র শোভা করে। দীপ্তিমন্ত নৌকা যেন বিজলি সঞ্চারে।।
মরকত স্তম্ভ সব রজতের ছানী। নবরঙ্গ খোপা যেন মুকুতা খেচনি।।
আগে পাছে চামর দোলায় ঘন ঘন। বিবিধ পতাকা উড়ে নৌকার শোভন।।
স্বর্ণ-শিখি পেখনে বিচিত্র-পাছা নৌকা। সুরচিত উষ্ণ অগ্র যেন দেখি শিখা।।
হুলাহুলি নৌকা বাহে মহুল বাজন। দুন্দুভি ভেউর ঢোল মেঘের গর্জন।।
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় নৌকার গঠন। পবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন।।
নানা বর্ণ পুষ্পপত্র যেন শোভা করে। নানা বর্ণ সব নৌকা নদী দীপ্তি করে।।
খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবন। সঙ্গে আশরাফ খান আদি পাত্রগণ।।
চতুর্দিকে পাত্রগণ মাঝে নৃপবর। তারকা বেষ্টিত যেন চন্দ্রমা সুন্দর।।
দ্বারাবতী উজ্জ্বল করিয়া ধর্মরাজ। দ্বারিকাতে শোভে যেন গোবিন্দ সমাজ।।
সৈন্য সমুদিত রাজা অটোপ করিয়া। চারি মাস রহে তথা হরষিত হৈয়া।।

তবে মহাপাত্র আশরাফ মহামতি। আপনা সভাতে আইলা রাজ অনুমতি।।
নানা জাতি লোক সবে ধরিল যোগান। সভাতে বসিলা শ্রী আশরাফ খান।।
সৈয়দ সেখ আদি মোগল পাঠান। স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র বহুতর। সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর।।
নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন। ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান।।
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান। নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান।।
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর। নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর।।
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মন্ডল। নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল।।
নানা পুষ্পে শোভে যেন বৃন্দাবন শোভা। লোকেরা শোভন করে মহাজন সভা।।
লোক হন্তে লোক কীর্তি রহে পৃথিবীত। চলি গেল রাজা সব রহিলেক কৃত।।
সুকতি যাহার না রহিল ভুবনে। নাহিক তাহার জীব, মরণ সমানে।।
সাফল্য জীবন যার রহিল সুনাম। নামে চিরজীবি হৈল জানকী শ্রীরাম।।
এতেক যে মহাজনে বুঝিয়া রহস্য। লোকেরে সাদর করি পালিবা অবশ্য।
শ্রীযুক্ত আশরাফ খান অমাত্য প্রধান। ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান।।
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রসচয়। পড়িলা মুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়।।
হেন মতে সভা কবি বসিয়া থাকিতে। কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে।।
আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ। বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ।
গুজাতি গোহারি ঠেট ভাষা বহুতর। সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সায়র।।
শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি। শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী।।
ভরতে পুরানে সত্য, সত্য যে বাখানে। চন্দন তিলক সত্য উগে সর্বস্থানে।।
প্রাণান্ত করিয়া সত্য পালে মহাজন। রাজ্যপাল ত্যাজি করে সত্যের পালন।।
সত্য বলে রাজ্য হৈল পান্ডব নন্দন। সত্য সে পরখ সিদ্ধি বিজয় কারণ।।
যত জাতি শাস্ত্র রীতি বৈসয় সংসারে। আদ্যে সত্য ধরি পাছে বড়াই বিচারে।।
ইসুপ সিদ্দিক শাহা রসূল আল্লাহর। সত্য বলে মিসিরের হৈলা অধিকার।।
সত্য বলে মহাপাত্র-বাড়িল উন্নতি। কোনমতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী।।
ঠেট চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে। না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।।
দেশীভাষে কহ তাকে পঞ্চালির ছন্দে। সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে।।
তবে কাজী দৌলত বুঝিয়া সে আরতি। পাঞ্চালির ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।।

উপরোক্ত কাব্যাংশ হতে আমরা প্রথমে রোসাঙ্গ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান জানতে পারি এবং রাজার নাম জানতে পারি। যেমন বলা হয়েছে- “কর্ণফূল নদী পূর্বে আছে এক পুরী। রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি।।

তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।" অর্থাৎ রোসাঙ্গ রাজ্যটি বর্ণফুলী নদীর পূর্বে অবস্থিত। লক্ষণীয়, কবি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীকে একক হিসাবে চিহ্নিত করে রোসাঙ্গ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচয় দিয়েছেন। এখান থেকে মনে হয় কবি দৌলত কাজী চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ এনামুল হক মনে করেন তিনি রাউজানের সন্তান। কবি তৎকালীন রোসাঙ্গ রাজার নাম শ্রী সুধর্মা রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যে রাজাকে মগধ বংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি থিথুধম্মা বা শ্রী সুধর্মা রাজা ১৬২২ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন। ইতিহাসে এই বংশ ম্রাউক-উ রাজবংশ নামে খ্যাত। কবি দৌলত কাজির বর্ণনাতে দেখা যায় তাঁর সময়ে রাজারা আস্তে আস্তে বৌদ্ধ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। এখান হতে বুঝা যায় তৎপূর্বে আরাকানের রাজারা ইসলামী ভাবাপন্ন ছিলেন। বাস্তবেও আমরা দেখি, ম্রাউক-উ বংশের রাজারা অভিষেকের মাধ্যমে একটি মুসলিম নাম গ্রহণ করেছেন। মুদ্রার এক পিঠে ফারসী ভাষায় মুসলমানদের কলেমা এবং অপর পিঠে রাজার মুসলিম নাম অংকিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আরাকানের বৌদ্ধরা 'মগ' নামে পরিচিত। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে 'মগ' শব্দটি মগধ হতে এসেছে। আরাকানের কবি-সাহিত্যিকেরা ও মগ এবং মগধ অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে ত্রয়োদশ শতকে ব্রাহ্মণ শক্তির অত্যাচারের মুখে 'মগ' সম্প্রদায় মগধ হতে পালিয়ে এসে আরাকান এসে আশ্রয় নেন এবং বসবাস শুরু করেন। শ্রী সুধর্মা রাজা ছিলেন এই বংশেরই অধঃস্তন পুরুষ।

মহাকবি দৌলত কাজির বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, রোসাঙ্গ রাজ্য ছিল অতি শক্তিশালী দেশ। রাজার হস্তী বাহিনীতে পনর শত হাতি ছিল। রাজার সৈন্য বাহিনীতে ছিল "অযুতে অযুতে সৈন্য অশ্ব নাহি সীমা।"

বলাবাহুল্য, লস্কর উজির আশরাফ খানের অনুরোধ ও পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" কাব্যগ্রন্থটি রচনায় হাত দেন। কাব্যে নিজের পরিচয় তিনি এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ চিত্তে আশরাফ খানের গুণগান বর্ণনা করলেও আশরাফ খানের বংশ পরিচয় উল্লেখ করেননি। যেমন বলা হয়েছে "শ্রী আশরাফ খান ধর্মশীল গুণবান, মুসলমান সবার প্রদীপ/ সে রসুল পরসাদে, গুরুজন আশীর্বাদে, রাজা হউক সখা

চিরঞ্জীব/ সুসন্ধানী সুবিক্রম, সুগম্ভীর সমুদ্রসম, কলিতে হাতিম সমদানে/ শত্রুশিরে দিয়াপদ, অর্জিলেন্ত সুসম্পদ, মহামন্ত আশরাফ খানে/ কহে কাজী দৌলত সাফল্য সে সম্পদ, যার নাম রহয় সংসারে।" কবি দৌলত কাজী "লস্কর উজীর আশরাফ খান"কে বিভিন্ন উপাধীতে ভূষিত করেছেন। যেমন মহামাত্য, মহাসত্য, মহামন্ত প্রভৃতি। তবে লস্কর উজীর হিসাবেই তিনি সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন বেশি। লস্কর উজীর আশরাফ খান সমগ্র রোসাঙ্গ রাজ্যে কতটুকু ক্ষমতা ও দাপট রাখতো তার পরিচয় পাওয়া যায় ডাচদের ডগরেজিস্টারসমূহের বর্ণনা থেকে। দৌলত কাজীর বর্ণনাতেও উল্লেখ আছে, "শ্রী আশরাফ খান লস্কর উজির/ যাহার প্রতাপ বজ্রে চূর্ণ অরি শির।" ডাচদের বর্ণনা থেকে এই বাক্যটির সত্যতা বুঝা যায়।

ডাচদের সংরক্ষিত তথ্যে শ্রী সুধর্মা রাজার দরবারের অতি প্রতিপত্তিশালী জনৈক লস্কর উজির এর বর্ণনা রয়েছে। ডাচদের ডগ রেজিস্টার অনুসারে ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে রাজধানী ম্রোহং এ ডাচদের একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, একটি চুক্তির মাধ্যমে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ বাণিজ্যিক ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছিল। ডাচদের কাছে রোসাঙ্গের বাণিজ্যিক গুরুত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না, কিন্তু ডাচদের কাছে দাস, ধান, কাপড়ের রঙ, হাতির দাঁত ইত্যাদি বিক্রী করলে আরাকান রাজা ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হন বিধায় রাজার বিশেষ অনুরোধে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ম্রোহং-এ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন।

ম্রোহং হতে ডাচ ব্যবসায়ীরা চাল এবং ক্রীতদাস সংগ্রহ করত। প্রকৃতপক্ষে এই ক্রীতদাসরা ছিল বাঙালি। মগ জলদস্যুরা বাংলার উপকূল ভাগ হতে এই সমস্ত লোকদের বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যেত। আরাকানের রাজা এদের কিয়দংশ দাস হিসাবে বিক্রি করত এবং বাকিদের আরাকানের অনাবাদী জমি আবাদ করে কৃষি উপযোগী করার কাজে লাগাতেন।

ডাচদের বিবরণ অনুসারে দেখা যায় দুটি বিষয় ম্রোহং-এর তৎকালীন ডাচ বাণিজ্যিক কেন্দ্রের কর্মচারীদের ভীষণভাবে বিব্রত করেছে। প্রথম ব্যাপারটি ছিল ডাচদের সকল চাল ক্রয় করতে হত জনৈক লস্কর উজিরের কাছ থেকে। অথচ শ্রী সুধর্মা রাজার সাথে ডাচদের চুক্তি ছিল ম্রোহং এর ডাচ বাণিজ্যিক কেন্দ্র সাধারণ খোলা বাজার হতে চাল সংগ্রহ করবেন। কার্যত দেখা গেল লস্কর উজিরের ভয়ে রোসাঙ্গের কোন লোক ডাচদের কাছে চাল বিক্রি করছে

না। এছাড়া আরও বিষয় হলো ডাচ ব্যবসায়ীরা রোসাঙ্গ হতে চাল ক্রয় করত এবং রোসাঙ্গ দেশে লোহা ও লৌহ নির্মিত পদার্থ বিক্রি করত। কিন্তু লস্কর উজিরের নির্দেশে আরাকানের জনসাধারণ ডাচ ব্যবসায়ীদের কাছে চাল বিক্রি করত না এবং ডাচদের কাছ হতে কোন কিছু ক্রয় করত না। ফলে ডাচ ব্যবসায়ীদের লস্কর উজিরের কাছ হতে বেশি দামে চাল ক্রয় করতে হয়েছে এবং অল্প দামে তাদের পণ্য লস্কর উজিরের কাছে বিক্রি করতে হয়েছে। ডাচ ব্যবসায়ীগণ চুক্তির শর্তের কথা উল্লেখ করে লস্কর উজিরের বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ করেও কোন ফল লাভ হয়নি। এ থেকে মনে হয় ডাচ ব্যবসায়ীগণ লস্কর উজিরের রাজকীয় মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না।

মহাকবি দৌলতকাজীর "সতী ময়না লোর চন্দ্রানী" শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে লস্কর উজির আশরাফ খানের রাজকীয় মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনানুসারে, মিনথা মং বা হোসেইন শাহের পর রাজপুত্র থিরিথুধম্মা (শ্রী সুধর্মা)কে রাজা মনোনীত করা হয়। নিয়মটি হলো, রাজাকে রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু রাজজ্যোতিষী জানাল যে, ক্ষমতাগ্রহণের এক বছরের মধ্যে থ্রি থু ধম্মা রাজার মৃত্যু হবে। এতে রাজমাতা আশরাফ খানের কাছে রাজ্যের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পন করে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। অতএব, রাজা নাম মাত্র ক্ষমতার অধিকারী হলেও প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মহাপাত্র আশরাফ খান।

দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তৎকালীন সময়ের একটি নিয়ম ছিল, যে কোন বিদেশী ইচ্ছা করলে যতদিন ইচ্ছা ততদিন আরাকানে থাকতে পারবেন এবং সম্মতি সাপেক্ষে যে কোন আরাকানী রমণীর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবেন। কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আরাকানী স্ত্রী ও আরাকানী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপীয়রা নিজেদের স্ত্রী-পুত্রদের আরাকানে রেখে আসতে ভীষণভাবে বিব্রতবাধ করতে থাকে। এই বিব্রতবোধের প্রধান কারণ হলো, ইউরোপীয়দের ফেলে আসা সন্তানগণ মুসলমান হিসাবে বড় হবে। তাই ইউরোপীয়রা আরাকান ছেড়ে চলে আসার সময় স্ত্রী-পুত্রদের বড় বড় মার্তবান মটকাতে লুকিয়ে নিয়ে আসতে চাইত। কিন্তু চতুর লস্কর উজিরের লোকজন প্রায় সময় লুকিয়ে রাখা আরাকানীদের ধরে রেখে দিত। ফলে ডাচ সম্প্রদায় সন্তানদের নিয়ে যাওয়ার

অনুমতি চেয়ে রাজার কাছে আবেদন জানায়। সুধর্মা রাজা কর্তৃক এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

উপরের এই ঘটনা হতে লস্কর উজির আশরাফ খানের ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। মহাকবি দৌলত কাজী বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "শ্রী আশরাফ খান লস্কর উজির। যাহার প্রতাপ-বর্জ্রে চূর্ণ অরি শির।" তাদের বর্ণিত উপরোল্লিখিত তথ্য হতে আমরা আরও জানতে পারি তৎকালের আরাকানী সমাজ ইসলামী ভাবধারায় চলত। যার ফলে ডাচদের ফেলে যাওয়া সন্তান-সন্ততি মুসলমান হিসাবে বড় হত। ডাচদের বর্ণনা মতে এখানে আরও একটি বিষয় দেখা যায় যে, ১৬৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আরাকানের রাজনীতিতে একজন নতুন লস্কর উজিরের আবির্ভাব ঘটেছে তবে এই নতুন লস্কর উজিরের আমলেও একচ্ছত্র চাল বিক্রি ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। ডাচদের বর্ণনা মতেও দেখা যায় যে, "কামা" নামে জনৈক মন্ত্রী ম্রোহং-এর ডাচ ব্যবসায়ী ও শ্রী সুধর্মা রাজার মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ডাচদের মুসলিম নামসমূহ উচ্চারণ ও লিখনের বানান এতই ত্রুটিপূর্ণ যে, "কামা" নামটি পড়ে অন্য কোন সূত্র ছাড়া তার আসল নাম আবিষ্কার সত্যিই কষ্টদায়ক।

যাহোক, ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৬৩৮ সালে শ্রী সুধর্মা রাজা ক্ষমতাচ্যুত হন ও মৃত্যুবরণ করেন। অতএব ডাচদের বর্ণনা হতে অনুমিত হয় যে, ১৬৩৭ সালের শেষভাগে এসে লস্কর উজির আশরাফ খান আরাকানের রাজনীতি হতে সরে এসেছেন। হয়ত বা তাঁর অবর্তমানেই আরাকান রাজার প্রাসাদ রাজনীতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি, থ্রিথুধম্মার পত্নী মিনসানি নরপতিগ্রী নামক শ্রী সুধর্মা রাজার জনৈক জ্ঞাতী ভ্রাতার সাথে আঁতাত করে শ্রী সুধর্মাকে হত্যা করে রোসাঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মিনসানিকে তাড়িয়ে নরপতিগ্রী (১৬৩৮-১৬৪৫ খৃঃ) শাসনভার দখল করে নেন। মহাকবি আলাওলের বর্ণনা হতে দেখা যায় নরপতিগ্রীর সৈন্যমন্ত্রী ছিলেন ছিদ্দিক বংশজাত কোরেশী বড় ঠাকুর, যিনি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুরের পিতা। অতএব ১৬৩৭ সালের শেষ ভাগে এসে ডাচ ব্যবসায়ীগণ যে নতুন লস্কর উজিরের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি কোরেশী বড় ঠাকুর হতে পারেন বলে আমাদের ধারণা।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রী সুধর্মা রাজার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। পর্তুগীজ পরিব্রাজক AUGUSTINE MONK SABASTAIN MANRIQUE শ্রী সুধর্মা রাজার অভিষেক স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তিনি এই অভিষেক অনুষ্ঠানের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মেনরিখ একজন ধর্মযাজক ছিলেন। অভিষেক অনুষ্ঠান বর্ণনা থেকে তাঁর মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬২৯ হতে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেনরিখ ম্রোহং অবস্থান করেন। মেনরিখের বর্ণনায় আরাকান রাজ সভায় মুসলমানদের অবস্থান এবং আরাকানের বন্দী বাঙালি মুসলমানদের কাহিনী স্থান পেয়েছে। তিনি আরাকানের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত কিছু মুসলমানদের কথাও বর্ণনা করেছেন। মেনরিখ-এর উল্লেখ থেকে আরও জানা যায় যে, আরাকানের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

মেনরিখের বর্ণনা অনুসারে, আরাকানের সকল বন্দীদের পর্তুগীজ ও মগদের নৌযানে করে বাংলার উপকূল ভাগ হতে নীত হয়েছে। নৌযানের নাবিকদের মধ্যে কিছু কিছু মুসলমান ছিল। মেনরিখ দাস বন্দীদের বহনকারী মুসলিম মাঝিমাল্লা পরিচালিত একটি নৌযানে করে ম্রোহং আসেন। তিনি এই সমস্ত বন্দী ও মাঝি মুসলমানদের খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। রোসাঙ্গ পৌছার পর মেনরিখ দেখতে পান যে, এই সকল বন্দীদের মুসলিম গার্ড বেষ্টিত অবস্থায় এক বিশেষ জায়গায় পুনর্বাসিত করা হয়েছে। নৌযান দিয়ে আগমনকালে তিনি মুসলিম নাবিকদের স্বধর্মাবলম্বী বন্দীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মুসলিম নাবিকেরা কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে নিবৃত থাকে। মেনরিখ কোনরূপ মন্তব্য শোনার জন্য বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ আছে, "শ্রী সুধর্মা রাজার একজন উপদেষ্টা বা চিকিৎসক আছে যিনি ধর্মে মুসলমান। মেনরিখ তাঁকে একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভণ্ড দরবেশ বলে আখ্যায়িত করেন। মেনরিখের বর্ণনা মতে, এই লোকটি নাকি রাজাকে বলতো যে, তিনি রাজাকে অদৃশ্য ও অপ্রতিরোধ্য করে দিল্লী, পেগু ও সিয়ামের সম্রাটে রূপান্তরিত করে দিতে পারবেন। তিনি আরও বলেন যে, এই মুসলিম চিকিৎসক দুবার মদীনা ভ্রমণ করেছেন। মেনরিখ অবশ্য মদীনার স্থলে ঘৃণিত মদীনা কথাটা উল্লেখ করেছেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে মেনরিখ উল্লেখ করেছেন, অনুষ্ঠানে মুসলিম ইউনিট সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুচকাওয়াজ এর সূচনা হয় মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনীর মাধ্যমে যার নেতৃত্বে ছিলেন জনৈক মুসলিম কমান্ডার। বর্ণনামতে, সেই মুসলিম ভন্ডপীরটি রৌপ্যখচিত অলংকারে সুশোভিত মখমলের সবুজ পোশাক পরিধান করে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সাজানো সাদা একটি আরবীয় ঘোড়ার উপর আরোহণ করে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের সর্বাগ্রে অবস্থান নেন। তার পেছনে ছ'শ অশ্বারোহী বাহিনী। এই বাহিনীর সৈন্যদের চোখেমুখে ভাসছিল ভন্ড পীরের দেখানো স্বর্গের কল্পিত স্বপ্নের আনন্দ। সকলের পোশাক ছিল সবুজ। তাদের গায়ের বাম কাঁধ হতে ঝুলছিল সবুজ রঙে আচ্ছাদিত ধনুক। বাম পাশে বাঁধাছিল সুদৃশ্য তুনীর যার ক্রস বেল্ট হতে ঝুলছিল রূপার প্রলেপ লাগানো বাঁকা শমশের। সকল ঘোড়াকে সবুজ সিল্কের কাপড়ে সাজানো হয়েছিল।"

উল্লেখ্য, মেনরিখ ডাচদের আশ্রয়ে আরাকানে অবস্থান করেছিলেন। এখানেও লক্ষ্য করা যায়, লস্কর উজিরের রাজকীয় মর্যাদা সম্পর্কে মেনরিখ কিংবা ডাচ বাণিজ্যিক কেন্দ্রের কারই কোন ধারণা ছিল না। মুসলিম বিদ্বেষী মেনরিখের বর্ণনা হতে মনে হয় উল্লিখিত ভন্ড দরবেশটি লস্কর উজির আশরাফ। তিনি যে একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন তাও মেনরিখের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। মহাকবি দৌলত কাজির বর্ণনায় বলা হয়েছে, "ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান। হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি খান্দান/ ইমান-রতন পালে প্রাণের ভিতর। ইসলামের অলঙ্কার শোভে কলেবর।"

তবে বাংলা সাহিত্যে লস্কর উজির আশরাফ খানের বড় অবদান হলো তারই অনুরোধে মহাকবি দৌলত কাজি "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" শীর্ষক এই মহাকাব্যটি অনুবাদের কাজে হাত দেন।

কোরেশী মাগন ঠাকুর ঃ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোরেশী মাগন ঠাকুর একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি হলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্য প্রতিভা। রোসাঙ্গ রাজসভায় রচিত বিখ্যাত কাব্য 'চন্দ্রাবতী' কোরেশী মাগনের এক অমূল্য সৃষ্টি। শুধু কবিতা রচনায় নয়, বাংলা সাহিত্য চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রেখেছেন এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই পদ্মাবতী গ্রন্থের সাথে জুড়ে আছে কোরেশী মাগনের নাম। বলা বাহুল্য, আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভার একজন সভাকবি ছিলেন।

বর্তমানে বার্মার অধীনে আরাকান প্রদেশটাই সেকালে রোসাঙ্গ রাজ্য হিসেবে খ্যাত ছিল। বাঙালি জাতির অনেক দুঃখ, বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষার আবেগী স্মৃতির সাথে এখনো মিশে আছে রোসাঙ্গ রাজ্য ও রোসাং রাজসভা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র এই রোসাঙ্গ রাজ্য। বাঙালি জাতির স্বকীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম রোসাঙ্গ রাজ্য। স্বাধীন রোসাঙ্গ রাজ্যের শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী বাঙালি মুসলিম সমাজ।

মহাকবি আলাওল যখন আরাকানে নীত হন, তখন সে দেশের রাজা ছিলেন থদোমিন্তার। তাঁর রাজ্যকাল ছিল ১৬৪৫ খৃঃ হতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন থদোমিস্তরের প্রধানমন্ত্রী।

মাগন রচিত 'চন্দ্রাবতী' কাব্যে রসুল প্রশংসা থাকলেও সমকালীন ইতিহাসে তাঁর জন্মবৃত্তান্তের কিছুই উল্লেখ নেই। এতে তার প্রচার বিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থে কোরেশী মাগন ঠাকুরের সম্যক পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন উল্লেখ আছে, "কন্যার বৈভব দেখি ভাবে নরনাথে/ এতেক সম্পদ সমর্পিমু কার হাতে/ এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে/ মহাসত্য মোসলমান সিদ্দিকের বংশে/ নানাগুণ পারগ মোহন্ত কুলীন/ তাহাকে আনিয়া নুপ কন্যা সমর্পিল।"

অতএব কোরেশী মাগন ঠাকুরের পরিবার ছিল আরব থেকে আগত সিদ্দিক বংশীয় মুসলমান। কুরাইশ বংশীয় বলে নামের প্রথমে কোরেশী যোগ করা হয়েছে। তাঁর পিতার নাম ছিল কোরেশী বড় ঠাকুর। স্পষ্টতই ঠাকুর তাঁর পারিবারিক উপাধি। পিতা তাঁর নাম মাগন কেন রেখেছিলেন এর পেছনের কারণও কাব্যে বর্ণনা আছে।

পিতা বড় ঠাকুর ছিলেন রাজা নরপদিগ্রীর সৈন্যমন্ত্রী। রাজা নরপদিগ্রী ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোসাঙ্গ শাসন করেন।

১৪৩০ খৃষ্টাব্দের সোলাইমান শাহর রাজত্বকাল থেকে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ নরপদিগ্রীর রাজত্বকাল পর্যন্ত রোসাঙ্গের প্রত্যেক রাজাই একটি মুসলিম

নাম গ্রহণ করেছেন। তবে দুষ্পাঠ্য ফরাসী শব্দ থেকে নরপদিগ্রীর মুসলিম নাম পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি বলে ডঃ শহীদুল্লাহ সহ অনেক গবেষক মত প্রকাশ করেছেন। আবার কিছু কিছু গবেষক এই পাঠটি দ্বিতীয় সেকান্দার শাহ বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু নরপদিগ্রীর পর আরাকানের আর কোন রাজাকে মুসলিম নাম গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তবে মুদ্রার এক পিঠে কলেমা খোদাই অব্যাহত ছিল।

আরাকান ইতিহাস বর্ণনা মতে দেখা যায়, নরপদিগ্রী এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা থ্রি থুধম্মাকে উৎখাত ও হত্যা করে রোসাঙ্গের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। থ্রি থুধম্মার মুসলিম নাম দ্বিতীয় সেলিম শাহ বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। যাহোক, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও তাঁর পিতা বড় ঠাকুর রাজা নরপদিগ্রীর অমাত্য ছিলেন। এর থেকে একথা অনুমিত হয়, বড় ঠাকুর থ্রি থুধম্মার অধীনে উচ্চ কোন সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময় লস্কর উজির আশরাফ খান ছিলেন থ্রি থুধম্মা রাজার প্রধানমন্ত্রী ও সৈন্যমন্ত্রী। এমন কি প্রশাসনিক শাসনকর্তা হিসেবে তিনি প্রায় তের বছর আরাকানের শাসনকার্যও পরিচালনা করেছেন। লস্কর উজির আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকবি দৌলত কাজী "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

থ্রি থুধম্মাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে কোরেশী বড় ঠাকুর জড়িত ছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে তিনি নরপদিগ্রীর সৈন্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মহাকবি আলাওলের বর্ণনা মতে, বড় ঠাকুরের কোন সন্তান হচ্ছিল না কিংবা হলে মারা যেতো বিধায় তিনি স্রষ্টার কাছে অনেক মেগে এক পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন বলে পুত্রের নাম রাখলেন মাগন ঠাকুর। যেমন বলা হয়েছে, "রাজসৈন্যমন্ত্রী ছিল বড়হি ঠাকুর'প্রভূত মাগিআ পাইল কুলদীপ সুর/ প্রভু স্থানে মাগি পাইল পরার্থনা করি/ তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি।"[২২]

সম্ভবত নরপদিগ্রীর মৃত্যুর আগেই কোরেশী বড় ঠাকুর মারা যান। নরপদিগ্রী রাজার এক কন্যা সন্তান ছিল। তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। রাজার বৃদ্ধ অবস্থায় এই কিশোরী কন্যাকে কার হেফাজতে রাখবেন এ চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। অবশেষে কন্যার তত্ত্বাবধানের ভার পড়লো মহাসত্য মুসলমান সিদ্দীক বংশের কোরেশী মাগন ঠাকুরের উপর। রাজকুমারীর সাথে বিয়ে হলো রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র থদোমিন্তারের সাথে। নরপদিগ্রীর মৃত্যুর পর

থদোমিন্তার রাজা হলেও মুখ্য পাটেশ্বরী ছিলেন নরপদিগ্রীর কন্যা। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে এক শিশু পুত্র রেখে থদোমিন্তার মারা যান।

থদোমিন্তার মৃত্যুর পর রোসাঙ্গ রাজ্যে নেমে আসে এক দারুণ দুঃশ্চিন্তা। সবাই ভাবতে থাকে, রাজ্য শাসন চলবে কি করে। অবশেষে কোরেশী মাগন ঠাকুরকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে রাণী রাজকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

এভাবে কোরেশী মাগন ঠাকুর সুদীর্ঘকাল অবধি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রোসাঙ্গ রাজ্যের রাজসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন উজ্জ্বল বর্ণের সুপুরুষ ও অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। আরবী, ফারসী, মঘী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁর ছিল পান্ডিত্য। গানের প্রতিও তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। তিনি নিজেও যেমন কাব্য রচনা করেছেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলা ভাষাকে করেছেন সমৃদ্ধশালী। শুধু তাই নয়, আরাকানের ইসলাম প্রচারে এবং প্রসারের জন্যেও তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। যেমন বলা হয়েছে, "ওলামা, সৈয়দ, শেখ যত পরদেশী/ পোষন্ত আদর করি বহু স্নেহবাসি। কাহাকে খতিব কাকে করেন্ত ইমাম/নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম।"

মহাকবি আলাওলের বর্ণনায় আরাকানের রাজনৈতিক ইতিহাস

মহাকবি আলাওলের কর্মজীবন কেটেছে আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ শহরে। রোসাঙ্গ শহরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে মহাকবি আলাওল বর্ণিত রাজনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। তাঁর জীবদ্দশায় মোগল যুবরাজ শাহসুজা আরাকান পালিয়ে যান। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন রোসাঙ্গ রাজার হাতে শাহসূজা ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের করুণ মৃত্যুর ঘঁটনা।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি শাহসুজার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আরাকানের রাজশক্তির সাথে মুসলমানদের কলহ বিবাদ শুরু হয়। হয়তবা কোন এক কুচক্রী মহল এই-ঘঁটনার সুযোগে রাজা ও মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাসের বিষ ছড়িয়ে দেয়। যেমন আলাওল বিরচিত "সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল" পুথির দ্বিতীয়াংশের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, "তার পাছে সাহাসুজা নৃপ কুলেশ্বর। দৈব পরিপাক আইল রোসাঙ্গ শহর।। রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে হৈল

বিসম্বাদ। আপনার দোষ হোন্তে পাইল অবসাদ।। যতেক মুসলমান তান সঙ্গে ছিল। নৃপতির শাস্তি পাই সর্বলোক মইল।। মির্জা নামে এক পাপী সত্য ধর্মভ্রষ্ট। শালেত উঠিল পাপী লোক করি নষ্ট।। যার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দভাব। অপবাদে নষ্ট করি পাইল নর্ক লাভ।। মরণ নিকটে জানি ইচ্ছাগত পাপ। যেজনে করএ সেই নর্ক মাগে আপ।। এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন। মিথ্যা কহি কত লোক করাইল বন্ধন।। আয়ুযুক্ত সব মুক্ত করিল অস্থানে। পাপ রাশি ধর্মনাশি মৈল শাল স্থানে।। বিনা অপরাধে মোরে দিল পাপ ছারে। না পাইয়া বিচার পড়িলুং কারাগারে।। বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুং কর্কশ। গর্ভবাস সম্পিল পঞ্চাশ দিবস।।"

উপরের বর্ণনা হতে বোঝা যায়া শাহসুজা শুধু স্বপরিবারে নিহত হননি, তার সাথে যত মুসলমান এসেছিল তাদের সবাইকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যে উল্লেখ আছে শাহসুজার সঙ্গে আগত সৈনিকদের রাজা চান্দা থুধম্মা বা চন্দ্র সুধর্মা (রাজত্বকালঃ ১৬৫২ খৃঃ হতে ১৬৮৪ খৃঃ) ক্ষমা করে স্বীয় দেহরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেন এবং দেহরক্ষী বাহিনীর এই সদস্যরা নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে রাজপ্রসাদ জ্বালিয়ে দেয়।

কিন্তু মহাকবি আলাওলের জীবনী পাঠে আমরা জানতে পারি তিনি নিজেই অশ্বারোহী সদস্য হিসেবে রাজার দেহরক্ষীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অতএব শাহসুজার আরাকান গমনের পূর্ব থেকেই রোসাঙ্গের মুসলমানদের নিয়ে রাজার দেহরক্ষী বাহিনী গঠিত হয়েছিল।

উপরোল্লিখিত কাব্যাংশ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, মির্জা নামক জনৈক কুচক্রী শাহসুজার সাথে জড়িত থাকার অপবাদ দিয়ে বহু লোককে কারারুদ্ধ করেন এবং এই পাপিষ্ট মীর্জার চক্রান্তের শিকার হয়ে মহাকবি আলাওল ও পঞ্চাশ দিন কারা ভোগ করেন। এ ঘটনা থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, শাহসুজার করুণ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুসলমানগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর অল্প কিছুকাল পর নবাব শায়েস্তা খানের কাছে চট্টগ্রামের পতন ঘটলে আরাকান রাজ্য সংকুচিত হয়ে জৌলুসহীন হয়ে পড়ে। আরাকান রাজার বিশাল নৌবাহিনী পর্যদস্ত হয় এবং সঙ্গত কারণেই এরা চাকরিহীন হয়ে পড়ে। এই সমস্ত নৌসেনারা ছিল আরাকানের মগ সম্প্রদায়ভুক্ত। নৌবিদ্যার পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুবৃত্তি ছিল এদের প্রধান পেশা। বেকার অবস্থায় স্বদেশে

ফিরে গেলে পর এরা হয়ে পড়ে রোসাঙ্গের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অন্যতম এক প্রতিপক্ষ। বলাবাহুল্য, এরা ছিল স্বভাবে অসভ্য ও বর্বর প্রকৃতির।

কথিত আছে, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে আরাকানের মগ সম্প্রদায় রোসাঙ্গের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বেপরোয়া জাতিগত নির্মূল অভিযান শুরু করে। রোসাঙ্গের মুসলমানেরা জোট বেঁধে সকল মগ দস্যুদের হত্যা করে এর জবাব দেয়।" এই সময় শাহসূজা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ভারতবর্ষ থেকে অনেক মুসলমান আরাকান এসে সমবেত হন। আরাকানের এমন এক অস্থির মুহূর্তে উচ্চাভিলাষী সামন্তরাজারা ছড়িয়ে দেন একের পর এক নানা চক্রান্তের জাল। সামন্তদের কারনে আরাকানের স্বাধীনতার প্রতীক রাজ পরিবারের ক্ষমতা যতই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় ততই আরাকানের রাজনৈতিক শক্তি মগ-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। সে সাম্প্রদায়িকতার মাশুল অদ্যাবধি দিতে হচ্ছে আরাকানের জনগণকে।

যাহোক, শাহসূজার করুন মৃত্যু কিংবা আরাকান রাজার এই নির্মম আচরণ আরাকানের রাজশক্তি ও জনগণের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য, আরাকানরাজ সান্দাথুধম্মা শাহসূজার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি তাকে একটি জাহাজে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

উল্লেখ্য, মহাকবি আলাওল শাহসূজার এই করুন মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "আপনার দোষ হোন্তে পাইল অবসাদ।" একি আলাওলের রাজভক্তি, ভয়; নাকি রোসাঙ্গের মুসলমানেরা প্রত্যাশা করেছিলেন শাহসূজার কন্যার সাথে আরাকানের অত্যন্ত সুদর্শন, সুপুরুষ ও তরুণ রাজা সান্দাথুধম্মার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হোক। হয়তবা, তেমন হলে আরাকান এক পরিপূর্ণ মুসলিম রাজ্যে পরিণত হতো।

মহাকবি আলাওল 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' পুঁথিটি রচনার কাজ শুরু করেছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুরের অনুরোধক্রমে। পুঁথিটি শেষ করার পূর্বেই মাগন ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন। এর দ্বিতীয় অংশ শেষ করেন শাহসুজার মৃত্যুর নয় বছর পর সৈয়দ মুসার অনুরোধে। সৈয়দ মুসা ছিলেন আরাকান রাজসভার একজন উচ্চপদস্থ আমাত্য। তিনি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুরের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবার কিছু কিছু সূত্রে এই পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে সৈয়দ মুসার স্থলে সৈয়দ মসুদ শাহা পাঠ করা হয়েছে। যেমন "সৈয়দ মসুদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী। জ্ঞান অল্প আছে বলে মোরে হৈল রাজী।। দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহত্ত্ব। কৃপাকরি দিলেন কাদেরী খিলাফত।"

মহাকবি আলাওল সর্বপ্রথম যে কাব্যগ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করেন তা হলো পদ্মাবতী। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এরপর মহাপাত্র সোলায়মানের অনুরোধে তিনি "সতী ময়না" রচনার অসম্পূর্ণ অংশ শেষ করেন। প্রকৃতপক্ষে "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" কাব্যগ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করেন আলাওলের প্রায় ত্রিশবছর পূর্বে মহাকবি দৌলত কাজী। লস্কর উজির আশরাফ খানের অনুরোধে দৌলত কাজী এটি রচনার কাজ শুরু করেন। কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। মহাপাত্র সোলায়মান আলাওলকে বাকি অংশ শেষ করতে অনুরোধ করেন। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় দৌলত কাজীর "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" কাব্যগ্রন্থটি রোসাঙ্গের জনগণের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল এবং আরও মনে হয় লস্কর উজির আশরাফ খানের নাম মানুষের মুখে মুখে তখনও উচ্চারিত হত।

কবি আলাওল তাঁর অপর একটি কাব্যগ্রন্থ "হপ্ত পয়কর" রচনার কাজ শুরু করেন চন্দ্র সুধর্মা রাজার মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মুহাম্মদের অনুরোধে। অপর একটি গ্রন্থ "তোহফা" রচনার কাজ শুরু করেছিলেন শ্রীমন্ত সোলায়মানের অনুরোধে। এরপর "দারা সেকান্দরনামা" রচনা শুরু করেন নবরাজ মজলিশের অনুরোধে। পুস্তকের প্রথমেই নবরাজ মজলিশের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছেঃ

হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ত্ব। মজলিশ নবরাজ তান মহামাত্য।।
রোসাঙ্গ দেশত আছে যত মুসলমান। মহাপাত্র মজলিশ সবার প্রধান।।
মজলিশ পাত্রের মহত্ত শুন এবে। নরপতি সবর্গ আরোহণ হৈল যবে।।
যুবরাজ আইশে যবে পাটে বসিবারে। দন্ডাইল পূর্বমুখে তক্তের বাহিরে।।
মজলিশ পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ। সম্মুখে দন্ডই করে দড়াই বচন।।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবে নিরন্তর। না করিলে ছলবল লোকের উপর।।"[১৮]

অর্থাৎ নবরাজ মজলিশ ছিলেন তৎকালীন রোসাঙ্গের মুসলমানদের প্রধান। রাজসভার প্রধানমন্ত্রী। আমরা আরও জানতে পারি, নবরাজ মজলিশই রাজা চন্দ্রসুধর্মার রাজ্যাভিষেককালে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন।

এ যাবৎ প্রাপ্ত মহাকবি আলাওলের রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ পাঠে আমরা জানতে পারি কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন চন্দ্রসুধর্মা রাজার পিতা থদোমিন্তারের রাজসভার প্রধানমন্ত্রী। মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হন নবরাজ মজলিশ। চন্দ্র সুধর্মা রাজার মুখ্য সেনাপতি ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ। সৈয়দ মাসুম শাহা ছিলেন রোসাঙ্গের বিচারপতি। রাজার অন্যতম এক আমাত্য ছিলেন শ্রীমন্ত সোলায়মান।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীন আরাকানের পতনকাল

শাহসূজার আরাকান গমন ও তার পরবর্তী রাজনীতি

কক্সবাজারের আঞ্চলিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির সাথে রয়েছে মুগল যুবরাজ শাহসূজার আরাকান গমন এবং আরাকান রাজার হাতে সূজা পরিবারের করুণ ঘটনার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব। কক্সবাজার জেলার ঈদগাহ, ঈদগড়, ডুলহাজারা প্রভৃতি ইউনিয়নের নামকরণের সাথে বিজড়িত যুবরাজ শাহসূজার স্মৃতি। এককালে এতদ অঞ্চলের পালাগীতি, বারমাইস্যা, গ্রামীণ হঁলা ইত্যাদিতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে গাওয়া হতো সূজা তনয়ার বিলাপ, পরীবানুর হঁলা ইত্যাদি।

শাহসূজার আরাকান গমন শুধু মাত্র একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা নয়। আমাদের লুপ্ত ইতিহাসের আলোক মশাল হিসেবেও এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কথিত আছে মুঘল যুবরাজ শাহসূজা চট্টগ্রাম থেকে দুর্ভেদ্য গভীর বন জঙ্গল, পাহাড় ও অজস্র পাহাড়ী ঢল নেমে আসা খরস্রোতা নদী অতিক্রম করে আরাকানের উদ্দেশ্যে যেদিন ঈদগড় এসে পৌঁছেন সেদিন রাতে আকাশে দেখা দেয় ঈদের চাঁদ। নানা প্রতিকূল কারণে মুঘল বাহিনীর সেখানে আর ঈদের জামাত আদায় করা সম্ভব হয়নি। ঈদগড় থেকে কিছুদূর পশ্চিমে এসে একটি স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করেন। অতঃপর এই স্থানটির নামকরণ হয় ঈদগাহ। আর যে স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করা সম্ভব হলো না, সে স্থানটির নাম হয়ে পড়ে ঈদগড়। বস্তুতঃ এ তথ্যটি ইতিহাস নির্ভর নয়, জনশ্রুতি নির্ভর। কক্সবাজারের অনেক পরিবার নিজেদের শাহসুজার সফরসঙ্গীর বংশধর বলে দাবী করে থাকেন। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক সুজা রোড ইদগাহ, ইদগড় এর উপর দিয়েই আরাকানের দিকে গেছে।

দিল্লীর সিংহাসন দখল নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ শুরু হয়। যুবরাজ শাহসূজা মুঘল সিংহাসন লাভের জন্যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হলে পথিমধ্যেই আওরঙ্গযেবের অনুগত সৈন্যবাহিনী দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন। এক খন্ডযুদ্ধে শাহসূজা পরাজিত হয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসেন। নিজ পুত্র বিন সুলতান অনেক টাকার বিনিময়ে চট্টগ্রামস্থ পর্তুগীজদের

মাধ্যমে আরাকানের তরুণ রাজা সান্দা-থু-ধম্মার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। যোগাযোগের বিষয় ছিল, আরাকানের রাজা সূজা পরিবারকে সাময়িকভাবে আশ্রয়দান করবেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল হলে অর্থাৎ শীতকাল আসলে রাজা এক সামুদ্রিক জাহাজে করে শাহসূজার পরিবার ও অনুগত অনুচর বাহিনীকে পবিত্র মক্কা নগরী পাঠিয়ে দেবেন এবং মক্কা নগরীতেই শাহসূজা তার শেষ জীবন কাটিয়ে দেবেন। আরাকান রাজা এতে রাজি হলে যুবরাজ শাহসূজা স্বপরিবারে অনুগত বাহিনীসহ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে স্থল পথে আরাকানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেন।

৩রা জুন, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে শাহসূজা স্বীয় পরিবার, হেরেম ও এক ক্ষুদ্র অনুচর বাহিনী নিয়ে স্থলপথে আরাকানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে তার সফর সংগীর সদস্য সংখ্যা প্রায় পনেরশ' জন বলে জানা যায়। রোসাঙ্গের রাজধানী ম্রোহং এ পৌঁছেন ২৬শে আগস্ট, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে। আরাকানের রাজা সান্দা-থু-ধম্মা পরম আতিথেয়তার সাথে যুবরাজ শাহসুজাকে গ্রহণ করেন। লেমব্রু নদীর তীরে বাবুধং পাহাড়ের পাদদেশে ওয়াথিক্রেক নামক স্থানের নদীর বিপরীত পার্শ্বে বাঁশের তৈরি একটি বাড়ি শাহ সূজাকে অবসর যাপনের জন্যে দেয়া হয়।[৩০] আরাকান রাজার প্রতিজ্ঞা ছিল প্রকৃতি শান্তরূপ ধারণ করলে অর্থাৎ শীত মৌসুমে খুব বড় এক সামুদ্রিক জাহাজে করে তাদের মক্কা নগরীতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। শাহসূজার ইচ্ছা তিনি তাঁর জীবনের বাকি দিন সমূহ মক্কাতে কাটিয়ে দেবেন।

আরাকান রাজা মুঘলদের রাজাকীয় ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের কথা শুনেছেন বটে। কিন্তু এতো ঐশ্বর্য্য ছিল তাঁর কল্পনাতীত। শাহসূজার রাজকীয় ঐশ্বর্য্য দেখে রাজা সান্দা-থু-ধম্মা স্থির থাকতে পারলেন না।[৩১] তাছাড়া শাহসূজার অপরূপ সুন্দরী কন্যা আমেনা বেগমকে দেখে সান্দা-থু-ধম্মা আরও অস্থির হয়ে উঠলেন।

অধীর আগ্রহে শাহসূজা অপেক্ষা করতে থাকেন। শীত আসলো। শীতকাল বুঝি চলে যায়। রাজার প্রতিজ্ঞা পালনে কোন উদ্যোগ নেই। অগত্যা শাহসূজা নিজেই একদিন রাজার কানে কথা তুললেন। বিনিময়ে সান্দা-থু-ধম্মা শাহসূজার কাছে কন্যা আমেনা বেগমকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালেন। প্রথমতঃ বিধর্মী, তদুপরি নীচ বংশজাত রাজা সান্দা-থু-ধম্মার কাছে নীল রক্তের অধিকারী মুঘল বংশের কন্যা সম্প্রদান এক অসম্ভব প্রস্তাব বলেই সূজা পরিবারে বিবেচিত হল।

এমনকি, সান্দা-থু-ধম্মা ম্রাউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সোলায়মান শাহের বংশজাতও নয়। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হলে সূজা পরিবারের সাথে আরাকান রাজার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভীত শাহসূজা গোপনে মহাপরাক্রমশালী মুসলিম আমাত্য ও সেনানায়কদের সংঘবদ্ধ করে সান্দা-থু-ধম্মাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। কিন্তু আরাকানের ঊর্ধ্বতন অভিজাতদের কেউই শাহসূজার কোনরূপ সাহায্যে এগিয়ে এলেন না। অতঃপর শাহসূজা সাধারণ সৈনিক ও নাগরিকদের রোসাঙ্গ রাজা ও তাঁর প্রতি উদাসীন মুসলিম আমাত্য ও সেনানায়কদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে স্বীয়পক্ষে নিয়ে আসার জন্যে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন এবং রোসাঙ্গের সিংহাসন দখলের চেষ্টায় মেতে ওঠেন। ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের নেতৃত্বে রোসাঙ্গ সেনাবাহিনী শাহসূজার প্রাসাদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শাহসূজা প্রাসাদ জ্বালিয়ে নিজ পরিবার, হেরেম ও তিনশত অনুচর নিয়ে রাতের মধ্যেই অন্যত্র সরে পড়েন। রোসাঙ্গ বাহিনী পিছু ধাওয়া করে শাহসূজার তিন পুত্র ও কন্যাদের আটক করে রাজার কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু শাহসূজা ও স্ত্রী পরিবানু নদীতে ডুবে মারা যান। আবার এমনও জনশ্রুতি আছে, অনুসরণকারীরা পাথর নিক্ষেপ করে শাহসূজাকে হত্যা করে, এমনকি শাহসূজার মৃতদেহ পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়নি।[৭২]

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শাহসূজার পুত্র-কন্যাদের রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। সান্দা-থু-ধম্মা তাদের কারারুদ্ধ করেন। পরে রাজমাতার মধ্যস্থতায় এদের মুক্তি দেয়া হয় এবং একটি সাধারণ কুটিরে বসবাস করতে দেয়া হয়। কিছুদিন পর রাজার দেহরক্ষী বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে রোসাঙ্গের রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেয়। এ বিদ্রোহের সাথে শাহসূজার পুত্রেরাও জড়িত আছে ভেবে শাহসূজার তিন পুত্রকে মারাত্মক কুঠারাঘাতে হত্যা করা হয় এবং সূজা কন্যাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে অনাহারে মেরে ফেলা হয়।

আওরঙ্গজেব হয়তো শাহসূজাকে পেলে হত্যা করতেন। কিন্তু দূরে রোসাঙ্গ রাজ্যে ভ্রাতা ও তার পরিবারের করুণ মৃত্যুকাহিনী তাকে বিচলিত করে তোলে। বিচক্ষণ সেনাপতি বাংলার সুবেদার শায়েস্তাখানকে নির্দেশ দেন এর প্রতিশোধ নিতে। নবাব শায়েস্তা খান ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আক্রমণ করে রামু পর্যন্ত মুঘল অধিকারভুক্ত করেন।

এদিকে শাহসূজার করুণ পরিণতি সারা ভারতের মুসলিম বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। দলে দলে মুসলমানেরা ভারত থেকে খোলা তলোয়ার হাতে আরাকান পাড়ি দিতে থাকে। শুধু তাই নয়, খোদ রোসাঙ্গেও শুরু হয় চরম অসন্তোষ। শাহসূজার পক্ষাবলম্বনের অপবাদে শুরু হয় বিভিন্ন মুসলমানের শাস্তি ও ধরপাকড়। মহাকবি আলাওলকে এই অপবাদে দুই বছর কারাদন্ড দেয়া হয়। কবি আলাওলের বর্ণনা মতে, মীর্জা নামক জনৈক কুচক্রী আলাওলের বিরুদ্ধে অপবাদ এনে কারাদন্ডের ব্যবস্থা করেন। পরে মীর্জাকেও শূলে চড়িয়ে মারা হয়।

১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে সান্দা-থু-ধম্মার মৃত্যুর পর মুসলমানগণ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। এদিকে চট্টগ্রাম থেকে মগ জলদস্যুরা সম্পূর্ণভাবে শায়েস্তা খানের হাতে পরাস্ত হয়ে আরাকানের সামুদ্রিক উপকূল ভাগে জড়ো হয়। দস্যুবৃত্তি তখন অলাভজনক হয়ে পড়ে।ফলে জলদস্যুরা ঘৃণার বশে আরাকানের বৌদ্ধদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধরে পাশবিক বর্বরতায় অভ্যস্থ জলদস্যুরা আরাকান পৌঁছলে পর, আরাকান নানারূপ অপকর্মে ভরে ওঠে। বর্বরতা ও পাশবিকতায় আরাকানের পরিবেশ নষ্ট হয়ে পড়ে। স্বদেশী বৌদ্ধরাও দস্যুদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে রোসাঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মগদস্যুরা এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। মুসলমানেরা দাঙ্গায় লিপ্ত সকল মগদস্যুদের হত্যা করে। এতে স্বদেশী মগ বৌদ্ধরা মুসলমানদের সহযোগিতা করে। দস্যুরা এই পরাজয়ের পর দাঙ্গা থেকে বিরত হলেও সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকেনি। এতে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়।

সান্দা-থু-ধম্মার মৃত্যুর পর মুসলমান সৈনিকগণ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। খোলা তলোয়ার নিয়ে তারা যত্রতত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে থাকে। ভারত থেকে আসা মুসলমানগণ এসে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। তারা যখন ইচ্ছা একজন রাজাকে ক্ষমতায় বসাতে এবং যখন ইচ্ছা রাজাকে তাড়িয়ে দিতে থাকে।

অতঃপর ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সান্দা-উইজ্যা নামক আরাকানের জনৈক সামন্ত রোসাঙ্গের ক্ষমতা দখল করেন এবং অত্যন্ত সুচতুরতার সাথে মুসলমানদের নিরস্ত করে আকিয়াব, রামরী প্রভৃতি এলাকায় কৃষিজ ভুমি দিয়ে মুসলমানদের কৃষিকাজে নিয়োজিত করেন। সান্দা-উইজ্যা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে

তারা আরাকানে নিয়ে যেতো। আরাকান রাজ এদেরকে পতিত জমি আবাদ করে কৃষি কাজে নিয়োগ করতো।"[৭৪]

বলাবাহুল্য, সুদীর্ঘ প্রায় দেড়শত বছর বাংলার মানুষদের উপর মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের এই দস্যুতা স্থায়ী ছিল। সুদীর্ঘকালব্যাপী দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত থাকার ফলে একদিকে যেমন আরাকানের সম্পদ ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি বাংলাদেশের লোকবল ও অর্থবলও হ্রাস পেয়েছিল। এসব দস্যুদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা বাংলার রাজন্যবর্গ সম্পূর্ণভাবেই হারিয়ে ফেলেছিল। দস্যুদের নৃশংস দস্যুবৃত্তির কারণে বাংলার সমগ্র উপকূলভাগ সম্পূর্ণরূপে জনমানবহীন হয়ে পড়েছিল। অথচ এককালে এই উপকূলভাগেই স্বাধীন বাংলার শাসনামলে সব চাইতে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছিল।

দস্যুদের দস্যুতার কারণে চট্টগ্রাম থেকে বাংলার প্রান্তস্থিত যুগদিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জনমানবহীন হয়ে পড়ে। সমগ্র এলাকা ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জানা যায়, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও এই অঞ্চল থেকে প্রায় তিনকোটি টাকা রাজকীয় রাজস্ব আদায় হতো। আজকের দিনের তুলনায় সেই যুগের তিন কোটি টাকার মুদ্রামান হিসেবকরলে সহজেই অনুমান করা যায়, এতদ অঞ্চলে কি পরিমাণ জনবসতি ছিল এবং কি বিপুল পরিমাণ জনশক্তি বন্দীত্বের কবলে পড়ে আরাকানে নীত হয়েছিল। বর্তমান আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের এক বিরাট অংশ এসব দুঃখী মানুষদেরই অধস্তন পুরুষ।

যাক, দস্যুদের অত্যাচারে বাংলার উপকূলভাগ মানব বসতিহীন হয়ে এমন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল যে, মানুষ তো দূরের কথা সাপ বিচ্ছুও যে এ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতে পারতো না। দস্যুদের অত্যাচার থেকে শুধু মানুষ রেহাই পায়নি, তাই-ই নয়, শূন্যমন্ডলের খেচর এবং জঙ্গলের পশু পর্যন্ত দস্যুরা খতম করে ফেলেছিল। সমগ্র বাংলার বিরাট উপকূলভাগ এমনভাবে মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল যে, ঢাকার শাসনকর্তা শুধুমাত্র ঢাকা রক্ষার জন্যে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও হিমশিম খাচ্ছিলেন। দস্যুদের প্রতিহত করার জন্যে নয়, বরং দস্যুদের আগমনের পথে বাধার সৃষ্টি করার জন্যে ঢাকার শাসনকর্তা ঢাকার কাছাকাছি নদীসমূহে লোহার শেকল দিয়ে দস্যুদের নদীপথে আগমনের পথ রুদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তৎকালীন বাংলার নাবিকরা দস্যুদের ভয়ে এতই সন্ত্রস্ত ছিল যে, একশ রণতরী মাত্র চারটি দস্যু জাহাজ দূর থেকে দেখে পালিয়ে আসতে পারলে এটাকে

বীরত্বের কাজ বলে মনে করতো। দস্যুদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই এক অসম্ভব কাজ বলে তারা মনে করতো।

নবাব শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয় :

এমনি এক অরাজক সময়ে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা ও বিচক্ষণ সেনাপতি শায়েস্তা খান বাংলার নবাবী পদ নিয়ে ঢাকা আগমন করেন। মোঘল যুবরাজ শাহসূজা আরাকান পালিয়ে গেলে বাংলার নবাবীর শূন্য পদে শায়েস্তা খান নিযুক্তি পান। আরাকান রাজার হাতে সূজা পরিবারের করুণ মৃত্যু দিল্লীর মোঘল শক্তিকে প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত করে তোলে।

নবাব শায়েস্তা খান ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ডাচ ফ্যাক্টরী কর্মকর্তাদের কাছ থেকেই শাহসূজার করুণ মৃত্যুকাহিনী সর্বপ্রথম জানতে পারেন। আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এও ডাচদের অনুরূপ এক ফ্যাক্টরী ছিল। ম্রোহং-এ অবস্থিত এই ডাচ ফ্যাক্টরীর প্রধান কর্মকর্তার নাম ছিল 'গেরিট ভন ভোরবারগ'।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ম্রোহং-এর ডাচ কর্মকর্তা গেরিট-এর লিখিত চিঠিসমূহ থেকে জানা যায়, প্রথমে শাহসূজা বঙ্গদেশ থেকে চট্টগ্রামের দিয়াঙ্গার আসেন। দিয়াঙ্গা আরাকান রাজার একটি নৌবহর ছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৩ জুন তারিখ শাহসূজা দিয়াঙ্গাতে পৌছেন। দিয়াঙ্গা থেকে তিনি স্থলপথে ম্রোহং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। দিয়াঙ্গার পর্তুগীজ দস্যুরা শাহসূজার কাছ থেকে তেইশ টনেরও অধিক মূল্যবান সম্পদ চুরি করেছিল।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখ শাহসূজা আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ পৌছান। আরাকানের রাজা শাহসূজাকে বসবাসের জন্যে নগরীরর পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত লেম্ব্রু নদীর উপরিভাগে অবস্থিত বাবুধং পাহাড়ের পাদদেশে ওয়াথি ক্রেকের উত্তর পার্শ্বে নদীর ধারে বাঁশের তৈরি একটি বাড়ি দান করেন। গেরিট ভন ভোরবারগের বর্ণনানুসারে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শাহসূজাকে হত্যা করা হয়।

নবাব শায়েস্তা খান ডাচদের কাছ থেকে শাহসূজার হত্যার কাহিনী শুনে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। বর্ণিত আছে, তিনি এক দরবার ডাকলেন এবং ডাচদেরকেও দরবারে আমন্ত্রণ জানালেন। নবাবের কাছে শাহসূজা হত্যার সংবাদ জানানোর জন্যে তিনি ডাচদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। তিনি ডাচদের কাছ থেকে 'গংগা' নামক বাণিজ্য জাহাজটি শাহসূজার পরিবার-

পরিজনদের ম্রোহং থেকে নিয়ে আসার জন্যে একজন দূত প্রেরণের উদ্দেশ্যে ধারস্বরূপ চেয়ে নিলেন। মীর্জা ওয়ালী বেগ নামক এক দূতকেও শায়েস্তা খান আরাকান প্রেরণ করলেন।

একইসাথে শায়েস্তা খান ম্রোহং-এর ডাচ কর্মকর্তা গেরিটের কাছে নবাবের দূতকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে একখানা চিঠি লিখে দেয়ার জন্যে ঢাকাস্থ ডাচ কর্মকর্তাকে বাধ্য করলেন। অন্যদিকে আরাকানের মন্ত্রীদের উৎকোচ দিয়ে হলেও নিহত শাহসূজার পরিবারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার জন্যে মীর্জা ওয়ালী বেগের হাতে গোপনে বার হাজার টাকা সমর্পণ করলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর ডাচদের বাণিজ্যতরী 'গংগা' নবাবের দূতকে নিয়ে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ পৌঁছে। কিন্তু আরাকানের রাজা চন্দ্র-সুধম্মা ঢাকার নবাবের দূতের সাথে দেখাও দিলেন না। সাথে সাথে ঢাকার নবাবকে বাণিজ্যতরী দিয়ে সাহায্য করার জন্য ডাচদের উপর ক্রোধান্বিত হলেন। তাছাড়া আরাকানের রাজার কাছে নবাব শায়েস্তা খানের লেখা চিঠিতে উল্লেখ ছিল যে, ডাচ, পর্তুগীজ, ইংরেজ সবাই নবাবের পক্ষে রয়েছে এবং প্রয়োজনে এরা সবাই আরাকানের বিরুদ্ধে ঢাকার নবাবকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। চিঠির এই উক্তিতে আরাকানের রাজা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন যে, নবাব শায়েস্তা খানের দূত কোনরূপ সফলতা ছাড়াই ঢাকা চলে আসেন। বিচক্ষণ সেনাপতি এতে বিচলিত হলেন না। তিনি আরাকানের উপর এক মরণাঘাত হানার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

মোঘলদের হাতে ছিল দক্ষ স্থলবাহিনী। কিন্তু নৌযুদ্ধে আরাকানীরা ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। মোঘলদের নৌবাহিনী ছিল না বললেও চলে। নৌযুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ নবাব শায়েস্তা খান এক বিশাল নৌ বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং স্থল যুদ্ধের জন্যে তের হাজার সৈন্যের এক বিশেষ স্কোয়াড গঠনও শুরু হয়ে গেল। শুধু এসবের মধ্যেই তিনি তাঁর কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেননি, আরাকান রাজার বিরুদ্ধে ডাচদের সহযোগিতা লাভের জন্যেও দৌত্যকর্ম শুরু করলেন। পাশাপাশি তিনি চট্টগ্রামে অবস্থিত আরাকান রাজার অনুগত পর্তুগীজদেরকেও মোঘলদের পক্ষাবলম্বনের জন্যে প্রলুব্ধ করতে থাকেন। বলাবাহুল্য তখন চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজার অধীন।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজা নৃশংসভাবে শাহসূজার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনদের হত্যা করার পর নদী পথে ঢাকা এবং সমুদ্রপথে কলিকাতা থেকে হুগলী পর্যন্ত চিরাচরিত লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ আরও জোরদার করে তুললো। সারা বাংলা ক্রন্দন, হাহাকার ও মাতমে ভেঙে পড়লো। অবস্থা আরও চরম আকার ধারণ করে যখন দস্যুরা ঢাকা আক্রমণ করে মগ দস্যুদের বিরুদ্ধে একটি মরণপণ যুদ্ধের জন্যে অপেক্ষমান মোঘল নৌবহরেরও বিপুল ক্ষতি সাধন করে অদৃশ্য হয়ে পড়লো। বিচক্ষণ সেনাপতি শায়েস্তা খান অল্প সময়েই এই ক্ষতি পূরণ করে নিলেন এবং চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে নিজ পুত্র বুজর্গ উমেদ খানকে এই বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। ইতিমধ্যে বটিভিয়ার ডাচ গভর্নরের কাছে গিয়াসুদ্দিন আহমেদকে দূত হিসেবে পাঠালেন, যেন ডাচেরা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ না থেকে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করেন। বাণিজ্যের প্রয়োজনে আরাকান রাজার চাইতে বাংলার নবাবের পক্ষাবলম্বন করাটা ডাচদের জন্যে ছিল অধিক লাভজনক। অবশেষে ডাচদের রণতরীসমূহও মোঘলদের দখলে আসে।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে হোসেন বেগ নামক এক সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যবাহিনীর এক বিশাল নৌবহর জলপথে অগ্রসর হতে থাকে চট্টগ্রামের দিকে। পুত্র বুজর্গ উমেদ খান দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হোসেন বেগের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয় স্থল পথে।

এ বিশাল নৌবহর ঢাকা থেকে বহির্গত হয়ে মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত যুগীদিয়া ও আলমগীর নামক স্থানে এসে উপনীত হয়। এখানে মগ সৈন্যদের দুইটি দুর্গ ছিল। হোসেন বেগ ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ দু'টি দখল করে নেন। এরপর মোঘল বাহিনী মগদের শক্তিশালী কেন্দ্র সন্দ্বীপে অতর্কিতভাবে হামলা শুরু করেন। এখানে মগদের অনেকগুলো শক্তিশালী দুর্গ ছিল। মগদের রণতরীর কিয়দংশ দখলে আসলেও দুর্গগুলো অবরোধ করা মোঘলদের জন্যে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। দুর্গের নির্মাণ ও রক্ষণ কৌশলে মগেরা এত দক্ষ ছিল যে, অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মগেরা দুর্গসমূহ রক্ষা করতে থাকে। হোসেন বেগের হাতে সময় ছিল খুবই কম। পিছন দিক থেকে মগদের সাহায্যে রণতরী পৌঁছার পূর্বেই হোসেন বেগের জন্যে দুর্গসমূহের দখল নেয়া ছিল অপরিহার্য। মোঘল বাহিনীর দুর্ধর্ষ ও বেপরোয়া আক্রমণের মুখে এক

মাসের মধ্যেই মগ দস্যুরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পড়ে এবং দুর্গসমূহ হোসেন বেগের দখলে আসে।

সন্দ্বীপ দখল করে হোসেন বেগ চট্টগ্রামে অবস্থিত পর্তুগীজদের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। পর্তুগীজরা যদি আরাকান রাজার পক্ষত্যাগ করে মোঘলদের পক্ষাবলম্বন করে, তবে তাদের বঙ্গদেশে বসবাসের সুবিধাসহ সকল নাগরিক সুবিধা দেয়া হবে এবং আরাকান রাজার চাইতেও অধিক ভাতা প্রদান করা হবে। অন্যথায় চট্টগ্রাম বিজয়ের পর সকলকেই হত্যা করা হবে। ইতিপূর্বে নবাব শায়েস্তা খানও নানারূপ প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে অনেক পর্তুগীজদের আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন। এর মধ্যে চট্টগ্রামের আরাকানী গভর্নরের নিকট প্রস্তাবটি ফাঁস হয়ে পড়লে তিনি সকল পর্তুগীজদেরই হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতে আরও ভীত হয়ে পর্তুগীজগণ সদলবলে পালিয়ে সন্দ্বীপ গিয়ে হোসেন বেগের আশ্রয় গ্রহণ করে। হোসেন বেগ সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে পর্তুগীজদের আশ্রয় দেন এবং তাদের মধ্য হতে যুদ্ধনিপুণ লোকদের স্বীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

ইতিমধ্যে মগ দস্যুদের নৌবাহিনী দক্ষিণের উপকূল ভাগ হতে হোসেন বেগের সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য অতিদ্রুত গতিতে এসে পড়লে চট্টগ্রামের কুমীরার উপকূলে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়। পর্তুগীজদের সহায়তায় মগদের কিছু নৌ জাহাজ হোসেন বেগ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হলেও প্রবল আক্রমণের মুখে মোগল বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয় এবং সমুদ্রের তীরে এসে পড়ে। নিশ্চিত পরাজয়ের মুহূর্তে স্থলপথে আগত বুজর্গ উমেদ খানের দশ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী হোসেন বেগের সাহায্যার্থে এসে পড়েন।

বুজর্গ উমেদ খান দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে অপরিসীম ক্লেশের মধ্য দিয়ে ফেনী নদীর তীরে এসে উপনীত হলে একদল আরাকানী সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হন। স্থলযুদ্ধে মোঘলদের তুলনায় আরাকানীরা দুর্বল ছিল বিধায়, তারা পশ্চাৎগমন করে চট্টগ্রামে পালিয়ে যায়। অতঃপর হোসেন বেগের সংবাদ শুনে তিনি ক্ষিপ্রগতিতে কুমীরার তীরে গিয়ে উপনীত হন।

মগদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পর্যদুস্ত হয়ে মোঘল রণতরিসমূহ সমুদ্রের তীরে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। এমনি এক মুহূর্তে বুজর্গ উমেদ খান স্থালভাগ থেকে মগদের উদ্দেশ্যে মাঝ সমুদ্রের পানে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ শুরু করেন।

এতে মগেরা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং চট্টগ্রামের দিকে পশ্চাদপসারণ করে। অতঃপর হোসেন বেগ ও উমেদ খানের মিলিত সৈন্য বাহিনী চট্টগ্রাম অবরোধ করেন। বহু সংখ্যক সুদৃঢ় বেষ্টনী ও বহু সংখ্যক কামান দ্বারা চট্টগ্রাম সুরক্ষিত থাকলেও কুমিরা থেকে মগ রণতরীসমূহের পশ্চাৎপসারণ, সন্দ্বীপে মগদের বিপর্যয় ইত্যাদিতে আরাকানী সৈন্যগণ রাতের আঁধারে দক্ষিণ দিকে পালাতে শুরু করে এবং অতি সহজেই চট্টগ্রাম মোঘলদের অধিকারে চলে আসে।

বুজর্গ উমেদ খান মগদের পশ্চাদ্বাবন করতে করতে কক্সবাজার জেলার রামু পর্যন্ত এসে পড়েন এবং রামু পর্যন্ত এলাকা মোঘলদের অধিকারভুক্ত করে নেন। এখানে এসে উমেদ খান বেশিদিন অবস্থান করলেন না, স্থানীয় এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করে বর্ষা আসার পূর্বেই চট্টগ্রাম চলে আসেন।

নবাব শায়েস্তা খানের দুঃসাহসিক চট্টগ্রাম বিজয় এতদঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। তিনি চট্টগ্রাম জয় করে এর নামকরণ করেন 'ইসলামাবাদ'। চট্টগ্রামসহ গোটা বাংলায় তিনি এমন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যে, অদ্যাবধি কিংবদন্তীর মতো শান্তির প্রতিক হিসেবে নবাব শায়েস্তা খানের আমলকে বাংলার মানুষ স্মরণ করে থাকে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, নবাব শায়েস্তা খান রামু পর্যন্ত এলাকা অধিকার করে আর অগ্রসর হননি। যদি হতেন, তবে আরাকান আজ বাংলাদেশেরই অধিকারভুক্ত হতো। শাহসূজার মৃত্যুর পর আরাকানের মুসলমানেরা সেদেশে সুদীর্ঘ বছর ধরে উন্মুখ শাসন চালাতে থাকে। যখন ইচ্ছা রাজাকে বসায়, আবার যখন ইচ্ছা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে থাকে। কিন্তু বাংলার রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আরাকানের মুসলমানেরা নিজস্ব কোন স্থিতিশীল সরকারই গঠন করতে পারেনি। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্মার আরাকান অধিকার পর্যন্ত আরাকানে স্থিতিশীলতার পুনরুদ্ধারও সম্ভব হয়নি। সম্ভবত অদ্যাবধি আরাকানের নৈরাজ্যের গূঢ়তত্ত্ব এখানেই। কেননা, বাঙালি মুসলমানেরাই ইতিহাসের বিচারে আরাকানের প্রধান উত্তরাধিকার।

পঞ্চম অধ্যায়

মগ-রাখাইন বিতর্ক

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাল থেকে যাদেরকে আমরা মগ বলে জানি, তারা দাবি করছে জাতিগত নামে তারা মগ নয়, তারা রাখাইন। তাই প্রশ্ন জাগে, ইতিহাসে যাদেরকে আমরা মগ বলে উল্লেখ পাই, তারা কারা? কক্সবাজার অঞ্চলের জনগণ এককালে প্রায়শঃ লক্ষ্যকরত একটি সাংকেতিক মানচিত্র ধরে আরাকান থেকে মগেরা এসে তাদের পূর্বপুরুষদের মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন মাটি খুঁড়ে নিয়ে যেত। আমরা কক্সবাজার অঞ্চলের অনেক নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারের খবর শুনি, যাদের পূর্বপুরুষ ছিল পালিয়ে যাওয়া মগদের ফেলে রাখা এমন একজন শিশু। পরবর্তীতে ফেলে যাওয়া শিশুটি মুসলমানদের ঘরে লালিত পালিত হয়েছে।

কিন্তু কেন মগদের এই পালিয়ে যাওয়া? অথবা মগদের এই গুপ্ত সম্পদগুলোই বা এলো কি করে?

রাখাইন শব্দটি আমরা কিছুটা বিকৃতভাবে হলেও ইতিহাসে পাই। আরাকান, ইউনিয়ন অব বার্মার অধীন একটি রাজ্য। বার্মার সংবিধানে আরাকানকে 'রাখাইনপ্রে' বা রাখ্যাইন রাজ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিছু কিছু রাখ্যাইন উপাখ্যানে বলা হয়েছে রাক্ষাপুরা বা রাক্ষসপুরী হলো আরাকানের আদি নাম। রাখ্যাইন উপাখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, আরাকানের আদি বাসিন্দারা ছিল রাক্ষস। পরবর্তীতে কোন দৈব ঘটনায় এরাও মানুষে পরিণত হয়েছে। রাখ্যাইনরা হলো এই সমস্ত রাক্ষসদের উত্তর পুরুষ। বলার অপেক্ষা রাখে না এ ধরনের উপাখ্যান ইতিহাস সিদ্ধ হতে পারে না।

চট্টগ্রাম শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও এ ধরনের একটি উপাখ্যান রয়েছে। উপাখ্যানে বলা হয়েছে, আগে চট্টগ্রামে দৈত্য-দানব বসবাস করতো। হযরত বদরশাহ পীর দৈত্যদের কাছ থেকে এক চাটি বরাবর জায়গা চেয়ে নেন। চাটি পরিমাণ জায়গায় বসে বদরশাহ একটি চেরাগ বা বাতি জ্বালালেন। মুহূর্তেই অলৌকিকভাবে বাতির আগুন বড় হতে হতে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দৈত্যরা পালিয়ে যায় এবং উক্ত স্থানে মানুষের বসতি গড়ে উঠে। তাই

জায়গাটির নাম চাটিগ্রাম এবং চট্টগ্রাম হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস এ ধরনের ঘটনাকে নির্ভুলভাবে মেনে নিতে চায় না। যদিও এ ধরনের ঘটনা থেকে ইতিহাস উপাদান সংগ্রহ করে।

রাক্ষসপুরী হিসেবে আরাকানটা আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। ষোড়শ শতকের কবি শাবারিদ খান এবং সপ্তদশ শতকের কবি মুহাম্মদ খান, একই ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে দু'জনেই যথাক্রমে "হানিফা ও কয়রাপরী" এবং "হানিফার লড়াই" শীর্ষক দু'টি পুথি রচনা করেছেন। দু'জনই রোসাঙ্গ রাজ্যের বাঙালি কবি।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, পুথির গল্পকাহিনী ইতিহাসের বিচারে নির্ভূল তথ্য নহে। তবুও এটা উপেক্ষণীয়ও নয়। উদাহরণস্বরূপ কক্সবাজারের গ্রামীণ জীবনে বিবাহ কিংবা ইত্যকার অনুষ্ঠানে এক বিশেষ সুরে গানের মাধ্যমে আনন্দের সাথে মেয়েরা নাচও পরিবেশন করে থাকে। স্থানীয় ভাষায় একে হঁলা বলা হয়ে থাকে। এর মধ্যে "মলকাবানু ও মনু মিয়ার হঁলা" এখনো জনপ্রিয়। খুরুস্কুল ইউনিয়নে 'মলকাবানুর' নামে একটি বাজার এখনো বিদ্যমান। এদের প্রেম কাহিনীর অনেকগুলো ঘটনা কল্পিত হলেও কাহিনীর মূল চরিত্র 'মলকাবানু' ও 'মনু মিয়া' দু'জনই বাস্তব সত্য। এদের প্রেমও বাস্তব।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত কবি শা'বারিদ খান ও মুহাম্মদ খানের সৃষ্ট পুথির কাহিনী সমূহ কল্পিত হলেও কাহিনীর মূল চরিত্রগুলোর মধ্যে বাস্তবতা থাকা নানা কারণে খুবই স্বাভাবিক। শা'বারিদ খানের "হানিফা ও কয়রাপরী" শীর্ষক পুথির কাহিনীর ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রাঃ) পুত্র মোহাম্মদ হানিফার সাথে সহিরাম রাজার যুদ্ধ, কয়রাপরীর সাথে হানিফার বিয়ে, দুর্মিক রাজার ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা মূল বিষয়। অনুরূপভাবে কবি মুহাম্মদ খানের রচিত "হানিফার লড়াই" শীর্ষক পুথির কাহিনী অনুযায়ী জৈগুন বিবি কর্তৃক শাহপরীর কন্যা কয়রাপরীকে অপহরণ, অতঃপর রোকাম শহরে গিয়ে মুহম্মদ হানিফা কর্তৃক কয়রাপরীকে উদ্ধার ও বিয়ে ইত্যাদি ঘটনা পরবর্তী পুথির বিষয়বস্তু। বলাবাহুল্য কক্সবাজার জেলায় শাহপরীর দ্বীপ বলে একটি স্থান রয়েছে। টেকনাফের ওপারে আরাকানের মংডু শহরের উপকণ্ঠে "হানিফার টংকী ও কয়রাপরীর টংকী" নামে দুইটি পাহাড়ের চূড়া রয়েছে। ইতিহাসের বিচারে উপরোক্ত কাহিনীর মূল চরিত্র এবং কাহিনীর প্রান্তিক ঘটনাসমূহ বাস্তব বলে ধরে নেয়া যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত।

উপরোক্ত কাহিনীর "শাহাপরী" কিংবা "কয়রাপরী" উভয়কে রাখ্যাইন উপাখ্যানে উল্লিখিত রাক্ষসপুরীর অধিবাসী রাক্ষসদের রাণী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রাক্ষস বলতে মনে করা যেতে পারে এরা মানুষ খেকো উপজাতি ছিল। পরবর্তীকালে আরাকানের মানুষ খেকো বাসিন্দারা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সুসভ্য হয়ে উঠলে রাজ্যটির আদি নাম রাক্ষসপুরী বা রাক্ষাপুরা বলে অভিহিত করে। অতঃপর বহুবছরে রাক্ষাপুরা বিবর্তিত হয়ে রাখ্যাইন নামে ঠেকে।

পঞ্চদশ শতকের পরিব্রাজক RALPH FITCH তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে আরাকানকে Kingdom of Rogen and Rame, আবার কোন কোন স্থানে আরাকানকে Kingdom of Recon বলে উল্লেখ করেছেন। আবার পরিব্রাজক BERNIER (1655-68) তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে আরাকানকে The kingdom of Rakan or Mog বলে অভিহিত করেছেন। অন্যত্র পর্তুগীজ পরিব্রাজক DUARTE BARBOSA আরাকানকে KINGDOM OF RACANGUY বলে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমসাময়িক কালের ডগরেজিস্টার সমূহে আরাকানকে 'আরাকান' বলে উল্লেখ করেছে।

গৌড়ের পতনের পর বাংলাদেশ দিল্লীর মোগলদের অধিকারে চলে গেলে আরাকান রাজসভা বাংলা সাহিত্যের প্রধান এবং একক চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয়। আরাকান রাজসভার প্রত্যেক বাঙালি কবিগণ আরাকানকে রোসাঙ্গ রাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, মগ শব্দটির উৎস কোথায়? অনেক রাখ্যাইন নেতা দাবি করেন, মগ শব্দটি আসলে 'জলদস্যু' অর্থ বহন করে। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ ভাষায় মগ শব্দটি জলদস্যু অর্থে ব্যবহৃত হয় তা এখনো জানা যায়নি। অপরপক্ষে অনেক রাখ্যাইন দাবি করেছেন, জাতিগত নাম হিসেবে 'মগ' শব্দটা সুখকর নহে। কেননা 'মগ' শব্দটি অতীতের জলদস্যুবৃত্তির পরিচয় বহন করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকেই যাদের আমরা মগ বলে জানি, তাদের একটি অংশ ভীষণভাবে জলদস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। জলদস্যুদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা অবর্ণনীয়। কিন্তু মগদের দস্যুগুরু ছিল পর্তুগীজরা। মগরা মূলত জলদস্যু নহে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের মতোই বৃটিশ জাতি ও দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত ছিল। দাস ব্যবসার খাতিরে নৃশংস

জলদস্যুবৃত্তিতে বৃটিশদের কুখ্যাতী মোটেও কম নয়। সাম্প্রতিককালের 'ROOT' বইটিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

যাহোক, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে প্রাথমিকভাবে মগরা জলদস্যু ছিল না। একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়েই মগরা জলদস্যুতে পরিণত হয়। অতএব মগদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত হয়েছে বলে মগরা রাখ্যাইন নামে পরিচিত হতে চায়- কথাটা ন্যায়সঙ্গত নয়। যেমন পর্তুগীজ, বৃটিশ এরা ইতিহাসের নৃশংশত দস্যুবৃত্তির সাথে জড়িত থেকেও তারা বৃটিশ কিংবা পর্তুগীজ।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে, মগ বলতে কাদের বুঝতে হবে? আরাকানে যে ক্যালেন্ডারটা অনুসরণ করা হয়, তাকে মঘী ক্যালেন্ডার বলা হয়ে থাকে। বাংলা বর্ষ, মঘী বর্ষ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রাচীন, অর্থাৎ বাংলা সন থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দেয়া হলে মঘী সন পাওয়া যায়। অতএব মঘী সনের আগেই বাংলা সন প্রচলিত হয়েছে। আমরা জানি, বাংলা সনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সম্রাট আকবরের সময়ে। বাংলাদেশ থেকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যে বাংলা সন বা ফসলি সন চালু হয়। সম্রাট আকবরের হিজরী বা আরবী সন মোতাবেক রাজ্যাভিষেক সালটাকে সৌরবর্ষে রূপান্তরিত করে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়। তাই বাংলা সন এবং হিজরী সন সময়ের একই বিন্দু থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, যেদিন বাংলা সনের নববর্ষ, ঠিক একই দিন মঘী সনেরও নববর্ষ। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষ যেদিন বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে, ঠিক একই দিন রাখ্যাইনরাও মঘী সনের অনুকরণে নববর্ষ পালন করে। রোসাঙ্গের বাঙালি কবিদের বিবরণেও আমরা মঘী সনের উল্লেখ পাই। তবে কি মঘী সন ও বাংলা সনের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে?

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রোসাঙ্গের বাঙালি কবিরা মগ এবং মগধ এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক ইতিহাস-বেত্তারাও মগদের ভারতের মগধ রাজ্য থেকে আগত বলে মনে করেন। যেমন দৌলত কাজীর সতি ময়নায়, "রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারি। তাহাত মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।" অন্যত্র- "মগধের সনের শুনহ বিবরণ।" আবার কবি আলাওলের বর্ণনায়- "মগধের সন কহি শুন গুণিগণ। (সপ্তপয়কর)। "মগধের সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণয়।" (তোহফা)। এছাড়াও ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালাতেও আরাকানের রাজাকে মগ রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।যেমন- "মগ রাজা সেকান্দর রণাঙ্গেতে গেল।

আমর মানিক্য স্থানে পত্র যে লিখিল।" (রাজমালা)। উল্লেখ্য, পূর্বেই বলা হয়েছে, আরাকানের রাজা অভিষেক করে একটি মুসলিম নাম গ্রহণ করতো।

তাই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে, আরাকান দেশ কোনটা? আবার রাখ্যাইন প্রে কোনটা? রোসাঙ্গ কোনটা? যাদেরকে আমরা মগ বলে জানি, তারা রাখ্যাইন হলে-মগেরা কোথায়? আগামী দিনের ইতিহাস গবেষকেরাই হয়ত এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। সম্ভবত ইতিহাসের এই জটটি খোলার জন্যে রাখ্যাইন গবেষকগণই অধিক ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ম্রাউক-উ রাজবংশের মুদ্রা

গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন শাহের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরমিখলা ওরফে সোলাইমান শাহ সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর গৌড়ে অবস্থান করছেন এবং সমকালীন বিশ্বের আধুনিকতম জীবন বোধ, রাজনীতি, রষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির সংস্পর্শে এসেছেন।

"He (Solaiman Shah) turned away from what was Buddhist and familiar to what was Mahomedan and foreign. In so doing, he loomed from the mediaeval to the modern, from the fargile fairy land of the Glass palace Chronicle to the robust extravaganza of the Thousand Nights and one night.

In this way, Arakan became definitely oriented towards the Moslem States. Contact with a modern Civilization resulted in a renaissance. The country's great age began." (Arakan's Place in the Civilization of Bay By M. S. Collis in Collaboration with san shwe Bu.)

এই সময় আরাকান স্বাধীন হলেও গৌড়ের সুলতানকে বাৎসরিক কর প্রদান করতো। গৌড়ের অনুকরণে খোদাইকরা মুদ্রা প্রথাও এই সময় চালু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দু' প্রকৃতির মুদ্রা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু হয়েছিল। এই দু' প্রকৃতির মুদ্রার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। প্রথম ধরনের মুদ্রা হিন্দু ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরি। হিন্দু মুদ্রাসমূহ রাজার প্রতিকৃতি ছবি, বিভিন্ন জীবজন্তু ও দেব-দেবীর ছবি অংকিত করে তৈরি করা হয়েছিল। কোন কোন মুদ্রায় রাজার রাজত্বকালও ধারণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ মুদ্রা থেকে রাজবংশসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক নির্ণয় কিংবা মুদ্রার কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

পক্ষান্তরে মুসলিম আমলের তৈরি মুদ্রা-সমূহ ভিন্ন প্রকৃতির। কোনরকম ছবি কিংবা প্রতিকৃতি মুসলিম মুদ্রায় স্থান পায়নি। প্রতিটি মুদ্রায় বাদশাহর নাম, উপাধী ও সিংহাসনে আরোহণকাল খোদাই করা হতো। তাছাড়া মুসলিম নরপতিদের মুদ্রাসমূহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রতিটি মুদ্রায়

আরবী হরফে মুসলমানদের কলেমা অত্যন্ত যত্নসহকারে খোদাই করা হতো। মুদ্রার অক্ষর লিখন পদ্ধতি দিয়ে মুসলিম মুদ্রার শৈল্পিক মান তৈরি করা হয়েছে। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ আক্রমণ ও অধিকারের পর থেকেই এদেশে মুসলিম শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের মুদ্রা প্রচলন শুরু হয়।

ভারতবর্ষের অনুরূপ আরাকানেও দুই ধরনের মুদ্রার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। ওজালী (Wasali) বা বৈশালীর হিন্দু প্রকৃতির মুদ্রা এবং ম্রাউক-উ রাজবংশের প্রচারিত মুসলিম প্রকৃতির মুদ্রা।

"The Coins found in Arakan belong to both the groups...... those of wesali are Hindu and those of Mrauk-U are Mahonmedan." (Arakan's Place in the Civilization of Bay).

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ আরাকান শাসন করতো। এই বংশ লেমব্রো (Lembro) নদীর তীরে ওজালীতে রাজধানী স্থাপন করেন। অষ্টম ও নবম শতকে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ওজালী বা বৈশালীর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রতি বছর হাজার হাজার আরবীয় জাহাজ বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ওজালীতে নোঙ্গর ফেলত এবং একই প্রয়োজনে ওজালী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরবদের বাণিজ্যিক বসতি। চন্দ্র রাজবংশের ইতিহাস রাদ-জা-তুয়েতে উল্লেখ আছে যে, এ বংশের রাজা মহত-ইং-চন্দ্রের রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ খৃঃ) কয়েকটি আরবীয় বাণিজ্য বহর রামব্রী (Ramree) দ্বীপের উপকূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জাহাজের আরোহীরা ভাসতে ভাসতে তীরে ভিড়লে পর, রাজা আরবীয় নাবিকদের আরাকানে বসতি স্থাপন করান। ৯৫৭ খৃষ্টাব্দে পরবর্তী সময়ে মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের ফলে এই রাজবংশ ধ্বংস হয়। ওজালীর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে প্রতীয়মান হয়, এই বংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিল। হয়তবা এই বংশের ধর্মীয় উদারতার কারণে মুসলিম আরবীয় নাবিকদের স্বদেশে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। আরাকানের প্রখ্যাত গবেষক ছেন-সুয়ে-বু (San Shwe Bu) এর মতে চন্দ্রবংশীয় রাজারা হিন্দু বংশীয় এবং মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। ছেন-সুয়ে-বু-এর মতে চন্দ্রবংশীয় রাজা ও দেশের জনগণ, উভয়েই ভারতীয় ছিল।

প্রখ্যাত গবেষক ছেন-সুয়ে-বু-এর এই অনুমান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান আরাকানের রাখ্যাইন বৌদ্ধরা (মগ) নবম শতকের পরেই আরাকানে এসেছেন। অনেক রাখ্যাইন (মগ) গবেষকদের মতে রাখ্যাইন জাতি ভারতের.

মগধ থেকে আগত। তাই মগ ও মগধ অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবত পরবর্তীতে আরাকানের আদি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বৃহত্তর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছে।

ওজালী আমলের বিভিন্ন আকারের মুদ্রা সমূহ উন্নত রূপার তৈরি। মুদ্রার উপর অংকিত হয়েছে দেবতা শিবের বিভিন্ন প্রতিকৃতি। নাগারী অক্ষরে যা কিছু খোদাই করে লেখা হয়েছে, তার অনেক কিছুই এখনো পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি ওজালীর মুদ্রাসমূহ হিন্দু ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের ওপর তৈরি।

"All these data indicate that the Coins of wesali were in the pure Brahmanical tradition. (Arakan's place in the Civilization of Bay)."

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ম্রাউক-উ রাজবংশের মুদ্রা গৌড়ের মুসলিম বাদশাহদের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। এক পিঠে ম্রাউক-উ বংশীয় রাজার মুসলিম নাম, সিংহাসনে আরোহণকাল এবং অপর পিঠে মুসলমানদের 'কলেমা' খোদাই করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গৌড়ের সুলতান নাসিরউদ্দীন সর্তৃক প্রচারিত একটি মুদ্রা শ্রদ্ধেয় ছেন-সুয়ে-বু-এর সংগ্রহে রয়েছে।

"It is noteworthy that one of that Sultan's Coins was recently found near the Site of that City. It is a unique document in the history of Arakan. When the moslems entered Bengal in 1203, they introduced inscriptional type of coinage. Nasiruddin's Coin is in the tradition and it was on that Coin and it follows that the coinage of Mrouk-U was subsequently modelled". (Arakan's Place in the Civilization of Bay.)

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে জেবুক শাহ আরাকানের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং গৌড়কে কর প্রদান বন্ধ করে দেন। এই সময়ও মুসলিম ঐতিহ্যমন্ডিত মুদ্রা প্রচলন অব্যাহত ছিল। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ম্রাউক-উ বংশের রাজা থ্রি-থু-ধম্মাকে হত্যাকরে নরপতিগ্রী (NARAPADIGRI) নামক এই বংশের এক ভ্রাতিভ্রাতা ম্রোহং-এর সিংহাসন দখল করেন। নরপতিগ্রীর মুসলিম নাম অস্পষ্ট ফার্সী হরফ থেকে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি বলে ডঃ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন। কেহ কেহ দ্বিতীয় সেকান্দর শাহ বলে উল্লেখ করেছেন। নরপতিগ্রীর পরবর্তী বংশধরগণ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্রোহং শাসন করেছেন। তখনও মুদ্রায় মুসলিম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সান্দা-থু-ধম্মার মৃত্যুর পর আরাকানে দেখা দেয় চরম গোলযোগ। এই সময় আরাকানের মুসলমানরা খোলা তলোয়ার হাতে উম্মত্ব শাসন শুরু করে দেয়। ঘন ঘন রাজার পরিবর্তন

হতে থাকে। কোন কোন রাজার মেয়াদ একদিনও স্থায়ী হয়নি। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গোলযোগ অব্যাহত ছিল। এই সময়েও মুদ্রার কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি।

"The Coins themselves exhibit little variation. Their design is neither more nor less interesting. It remains in the Mohomedan tradition of 1430 A. D." (Arakan's Place in the Civilization of Bay.)

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্মার রাজা ভোদাপায়া আরাকান অধিকার করে, আরাকানকে বার্মার একটি প্রদেশে পরিণত করেন। ইতিপূর্বে বার্মার মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন ছিল না। আরাকানে এসেই ভোদাপায়া মুদ্রার সাথে পরিচিত হলেন এবং আরাকানের অনুকরণে বার্মার রাজা ভোদাপায়া প্রথম বার্মায় মুদ্রার প্রচলন করেন। "The Burmese had never used coins and hence he had no model of his own. He copied therefore the moslem design." (Arakan's Place in the Civilization of Bay.)

রাজা ভোদাপায়া আরাকানের অনুরূপ বিচার ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা প্রভৃতি চালু করার জন্যে তিন হাজার সাতশত মুসলমানকে আরাকান থেকে জোর করে বার্মায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তিন হাজার সাতশত মুসলমান এর বংশধরেরা বার্মায় এখনো থুম-টং-খুইয়া (THUM HTAUNG KHUNYA) নামে পরিচিত। বর্মী ভাষায় এই শব্দের অর্থ "তিন হাজার সাতশত"।

সপ্তম অধ্যায়

আরাকানের রাজনৈতিক ইতিহাসের উত্থান পতন

ইতিহাস অধ্যয়নে দেখা যায়, বাংলাদেশ এবং বার্মার মধ্যে দু'বার সামরিক সংঘাতের সূচনা হয়। এর প্রথমটিকে প্রথম বাংলা -বার্মা যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টিকে দ্বিতীয় বাংলা-বার্মা যুদ্ধ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আরাকানে বর্মী সৈন্যদের দখলদারিত্বের টানাপোড়নেই এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

প্রথম বাংলা-বার্মা যুদ্ধের পটভূমি ঃ আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখযোগ্য, খৃষ্টীয় অষ্টম হতে দশম শতকে চন্দ্রবংশীয় রাজারা আরাকান শাসন করতেন। লেমব্রো নদীর তীরে ওজালী বা বৈশালী ছিল এই বংশের রাজধানী। এই বংশের লিখিত ইতিহাস 'রাদজা তুয়ে' অনুসারে অনেক আরবীয় বণিক এই সময় আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং এই সময় রাজধানী ওজালীতে প্রতিবছর শত শত আরবীয় জাহাজ বাণিজ্য ব্যাপদেশে এসে ভিড়ত। প্রখ্যাত আরাকানী গবেষক স্যান-সুয়ে-বু ও এম এস কলিস সন্দেহাতীতভাবে মনে করেন যে, চন্দ্রবংশীয় শাসনকালে রাজা এবং প্রজা উভয়ই বাঙালি জাতির অর্ন্তগত ছিল।

যাহোক, দশম শতকে চন্দ্রবংশের পরবর্তী সময়ের উপর ক্ষীন তথ্য নির্ভর ইতিহাস পাওয়া না গেলেও ত্রয়োদশ শতকে মগধ বংশীয় রাজাদের আরাকান শাসনের কথা উল্লেখ আছে। এই বংশের রাজধানী ছিল লেমব্রো নদীর তীরে লংগ্রেত।

বার্মা রাজার আরাকান দখল

১৪০৪ খৃষ্টাব্দে মগধ বংশের যুবরাজ নরমিখলা পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, লংগ্রেত-এর প্রধান পুরোহিতের সহায়তায় মাত্র চব্বিশ বছরের যুবরাজ নরমিখলা নিজ চাচাকে হত্যা করে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনুরূপভাবে নরমিখলার চাচা ও নরমিখলার পিতা অয়ুথোকে হত্যা

করে লংগ্রেত-এর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যাহোক, সিংহাসনে আরোহণ করেই নরমিখলা 'সাঁবুইউ' নাম্নী এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে অপহরণ করে। 'সাঁবুইউ' ছিল ডেল্লা নামক অপর এক দেশীয় রাজার ভগ্নী। হয়তোবা 'সাঁবুইউ' এর সাথে নরমিখলার গভীর সখ্যতা ছিল, কিন্তু চাচার চক্রান্তে ওদের বিয়ে হয়নি। যহোক এই অপহরণের কারণে সকল দেশীয় রাজাগণ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন। দেশীয় রাজাগণ জোট বেঁধে 'সাঁবুইউ'কে ফেরত দেয়ার জন্য নরমিখলার কাছে দাবি জানায়। সে দাবি অগ্রাহ্য হলে দেশীয় রাজাগণ বার্মার রাজাকে আরাকান আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৪০৬ সনে বার্মার রাজা এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখলা আরাকান হতে পালিয়ে তদানীন্তন বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকান বার্মার অধিকারভুক্ত হয়।

গৌড়ীয় সৈন্যদের আরাকান দখল

গৌড়ে এসে নরমিখলার জীবনে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরকাল গৌড়ে অবস্থান করে তিনি মুসলমানদের ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্পর্শে আসেন। বস্তুতঃ নরমিখলা গৌড়ে এসে তৎকালীন সময়ের আধুনিকতম জ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর তিনি মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে আরাকানে ফিরে আসেন।

১৪৩০ খৃস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন শাহ্ ওয়ালীখান নামক এক সেনাপতির নেতৃত্বে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য নরমিখলাকে সাহায্য করেন। কিন্তু ওয়ালী খান আরাকান দখল করে নিজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নরমিখলা পুনরায় পালিয়ে গৌড়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছর ১৪৩১ খৃস্টাব্দে, জালালুদ্দীন শাহ সিদ্ধিখান নামক অপর এক সেনাপতির নেতৃত্বে পুনরায় একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে নরমিখলাকে স্বদেশ উদ্ধারে সাহায্য করেন। ওয়ালীখান প্রাণভয়ে পালিয়ে যান, সকল গৌড়ীয় সৈন্য সিদ্ধী খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। এটিই ইতিহাসে প্রথম বাংলা-বার্মা যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে আরাকান বাংলাদেশের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৪৩১ খৃস্টাব্দে গৌড়ের করদ রাজা হিসেবে নরমিখলা আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে ম্রাউক-উ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৩১ খৃস্টাব্দ হতে ১৫৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশ

গৌড়ের রাজাদের নিয়মিত কর প্রদান করেন। অতঃপর গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের পতনের পর ১৫৩১ খৃস্টাব্দে ম্রাউক-উ রাজবংশের দ্বাদশতম পুরুষ জেবুক শাহ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় বাংলা-বার্মা যুদ্ধ

১৬৬০ খৃস্টাব্দে মোগল যুবরাজ শাহসূজা স্বীয় ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের ভয়ে স্ব-পরিবারে পালিয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আরাকানের রাজা সান্দাথুধম্মা বা চন্দ্র-সুধর্মা নির্মমভাবে শাহসূজা ও তৎপরিবার পরিজনকে হত্যা করে। এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে আরাকানের মুসলিম শক্তি ও রাজশক্তির মধ্যে সংঘাতের সূচনা হয়। এক পর্যায়ে মুসলমানরা রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেয়। খোলা তলোওয়ার হাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সান্দা উইজ্যা নামক জনৈক সামন্ত মুসলমানদের শান্ত করে কৌশলে নিরস্ত্র করেন এবং রামব্রী এলাকায় মুসলমানদের মাঝে প্রচুর জমি বিতরণ করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু সান্দাউইজ্যা আরাকানের শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বিভিন্ন সামন্তদের নেতৃত্বে আরাকান ছয়টি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোন সামন্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাজধানী 'ম্রোহং'এর ক্ষমতা দখলে উদ্যোগী হলে অন্য সামন্তগণ জোট বেঁধে সেই উদোগ ব্যর্থ করে দেয়। অতঃপর ১৭৮২ খৃস্টাব্দে 'থমোদা' নামক রামব্রীয় জনৈক সামন্ত ম্রোহং-এর ক্ষমতা দখল করেন। ফলে অন্যান্য সামন্তগণ 'থামাদা' এর বিরোধিতায় ব্যর্থ হলে পর 'ঘা-থান-ডি' নামক জনৈক সামন্তের নেতৃত্বে বার্মায় গিয়ে বার্মার রাজা ভোদাপায়াকে আরাকান আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পররাজ্য লোভ বর্মী রাজাদের অতি মজ্জাগত ব্যাপার। রাজা ভোদাপায়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আরাকানের সামন্ত রাজা ঘা-থান-ডি ও বার্মার রাজা ভোদাপায়ার মধ্যে চুক্তি ছিল যে, গৌড়ের রাজা জালালুদ্দীন শাহের মত বার্মার রাজা ভোদাপায়া আরাকানের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ন রাখবেন এবং ঘা-থান-ডিকে আরাকানের স্বাধীন রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন। বিনিময়ে ঘা-থান-ডি বার্মার রাজা ভোদাপায়াকে বাৎসরিক কর প্রদান করবেন।

১৭৮৪ খৃস্টাব্দে বার্মার রাজা ভোদাপায়া এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরাকান আক্রমণ করেন। কথিত আছে বর্মী সৈন্যরা আরাকান আক্রমণ করলে

পর আরাকানীরা সামন্তরাজাদের অনুপ্রেরণায় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে বর্মী সৈন্যদের স্বাগত জানায়। প্রকৃতপক্ষে, ভোদাপায়া আরাকান দখল করে সকল চুক্তি অস্বীকার করে আরাকানকে বার্মার অংশে পরিণত করেন। ঘা-থান-ডিকে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার পরিবর্তে তাকে আরাকানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ক্ষমতালোভী সামন্তদের অনুপ্রেরণায় আরাকানীরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পরম আনন্দে বর্মী সৈন্যদের স্বাগত জানালেও এই আনন্দ এক মাসও স্থায়ী হয়নি। অতি অল্পদিনের মধ্যেই আরাকানীরা দেখতে পেল বর্মী সৈন্যদের নির্মম, বর্বর ও পাশবিক চরিত্র।

১৪৩১ খৃস্টাব্দে ম্রাউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সোলাইমান শাহের নেতৃত্বে (নরমিখলা) যে স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা ছিল বর্মীদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। উল্লেখ্য, ১৪৩১ খৃস্টাব্দ হতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের স্বাধীন রাজবংশ গৌড়ের রাজাদের কর প্রদান করত। কিন্তু গৌড়ের রাজবংশের পতন ঘটলে পর ১৫৩১ খৃস্টাব্দে ম্রাউক-উ বংশের দ্বাদশ পুরুষ জেবুক শাহ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই বংশের শক্তিশালী রাজা সেলিম শাহ সমগ্র বার্মা পর্যন্ত এই বংশের সীমানা বৃদ্ধি করেন। অতএব বার্মা ছিল শতবর্ষকালব্যাপী আরাকান সম্রাজ্যের অধীন। ম্রাউক-উ বংশের শাসনামলে গৌড়ের অনুকরণে মুদ্রা ব্যবহার প্রচলন ছিল। কাজীর মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। সর্বোপরি আরাকানীরা ছিল স্বাধীনতার চেতনায় গর্বিত একটি জাতি।

পশ্চাৎপদ বর্মী সৈন্যরা আরাকানে এসে দেখল মানুষের ঘরে ঘরে সম্পদ। বর্মীরা আরাকানে এসেই মুদ্রা ব্যবহারের সাথে পরিচিত হয়। ফলে শুরু হয় বর্বর সৈন্যদের হত্যা, রাহাজানি ও লুণ্ঠন। বর্মী সৈন্যরা যত্রতত্র আরাকানীদের বন্দী করে মুক্তিপণ আদায় করতে থাকে। মুক্তিপণ আদায় না করলে পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমে বন্দীদের হত্যা করতে থাকে। এমনকি চরম নির্যাতনের মাধ্যমে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। বর্মী সৈন্যদের অত্যাচারে মাত্র দশ বছরে আরাকান দেউলিয়া হয়ে পড়ে। বহু আরাকানী সামন্ত অনুচরবাহিনী নিয়ে নাফ নদীর এপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সীমানার গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয় এবং আরাকানে অবস্থানরত বর্মী বাহিনীর উপর চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে বর্মীদের বিরুদ্ধে আরাকানীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনাকরে।

বর্মী সৈন্যদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে দলে দলে আরাকানীরা বিপ্লবীদের সাথে যোগদান করে বিপ্লবীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে।

ফলে বর্মী সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, কোম্পানি সরকারের ভূ-খন্ড হতে আরাকানী বিদ্রোহীরা বর্মী সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ফলে বার্মা সরকারের বিরুদ্ধে কোম্পানি সরকারের ভূ-খন্ড হতে আরাকানীদের এহেন তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোম্পানি সরকারের কাছে বর্মীরা অনুরোধ জানায়। পরবর্তীতে এই অনুরোধ হুঁশিয়ারিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার বর্মীদের সদা ভয়ের চক্ষে দেখত। এই সময় ভারতে নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করতে কোম্পানি সরকার হিমশিম খাচ্ছিল। পূর্ব সীমান্তে অপর একটি রণক্ষেত্র তৈরি করার কথা কোম্পানি সরকার স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। বর্মী সৈন্যদের আক্রমণের ভয়ে কোম্পানি সরকার বাংলা-বার্মা সীমান্তে সৈন্য পাঠিয়ে আরাকানীদের বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কোম্পানি সৈন্যদের লক্ষ্য ছিল, আরাকানী বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল ধ্বংস করা, বিদ্রোহীদের কর্মকান্ড বন্ধ করা এবং আরাকান হতে উদ্বাস্তুদের কোম্পানি সরকারের ভূখন্ডে প্রবেশ করতে না দেয়া। এই সময় কোম্পানি নেটিভ সৈন্যরা আরাকান হতে আগত একদল উদ্বাস্তুদের স্বদেশে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলে, উদ্বাস্তু নেতা জানিয়েছিল, "আমরা কখনও আরাকান ফিরে যাব না। যদি আপনারা আমাদের হত্যা করতে চান, তাহলে আমরা মরতে রাজি আছি। যদি আপনারা আমাদের জোর করে তাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা গভীর জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করব, যে জঙ্গল বন্য জন্তুদের নিরাপদ আশ্রয়।"

বাস্তবে কোম্পানি সৈন্যরা যত প্রচেষ্টাই চালাক না কেন, উদ্বাস্তুরা গভীর অরণ্য অঞ্চলের নানা পথে কোম্পানি সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে চলে আসতে থাকে এবং বর্মী সৈন্যদের উপর চোরাগুপ্তা হামলা অব্যাহত রাখে। ১৭৯৪ খৃস্টাব্দে একদল বর্মী সৈন্য টেকনাফ সীমান্ত অতিক্রম করে একদল বিদ্রোহীদের সন্ধানে কোম্পানি ভূখন্ডে প্রবেশ করে। বর্মী সৈন্যদের আক্রমণাত্মক যে- কোন তৎপরতা বন্ধ করার জন্য কোম্পানি সরকার কর্নেল ইরস্কাইন (Coronel Erskine)কে টেকনাফ সীমান্তে প্রেরণ করেন। বর্মী সৈন্যের কমান্ডার তিনজন

বিদ্রোহী নেতাদের বন্দী করে তাদের হাতে সমর্পণ না করলে টেকনাফ ছেড়ে পেছনে যাবে না বলে কর্নেল ইরস্কাইনকে হুমকি দেয়। ভীত কোম্পানি সরকার অত্যন্ত শঠতার মাধ্যমে তিনজন বিদ্রোহী নেতাদের সহযোগিতা দেবে বলে লোভ দেখিয়ে আলোচনার নামে এনে বন্দী করে বর্মীদের হাতে তুলে দেন। তিনজন বিদ্রোহী নেতার মধ্যে একজন পালিয়ে আসতে সমর্থ হন, কিন্তু অপর দুইজনকে বর্মীরা অত্যন্ত বর্বরতম কায়দায় অত্যাচার করে তিলে তিলে হত্যা করে।

কর্নেল ইরস্কাইন এর এই কাপুরুষোচিত কান্ডে সারা ভারতে ধিক্কার ধ্বনি ওঠে। একে সভ্য মানুষের কান্ড নয় বলে অভিহিত করা হয়। ভারতে বসবাসকারী বৃটিশ নাগরিকরাও সমালোচনায় অংশগ্রহণ করে। ঐতিহাসিক পিয়ারীর মতে, বৃটিশদের এই কাজটি বর্বরোচিত। বিদ্রোহীরা কোন আসামী নয়, এরা ছিল স্বদেশ উদ্ধারের লক্ষ্যে নিবেদিত সাহসী মুক্তিযোদ্ধা।

যাহোক, কর্নেল ইরস্কাইন এর এই ঘৃণ্য কাজ বর্মী সৈন্যদের মনোবল আরও বৃদ্ধি করে দেয়। বর্মী সৈন্যরা আরও ধারণা করে নেয় যে, বাংলা সীমান্তে যতই আক্রমণ পরিচালনা করা যাবে ততই কোম্পানি সৈন্যদের দুর্বল ও ভীত করে তোলা যাবে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বার্মার রাজা ভোদাপায়া ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে থাইল্যান্ড অভিযানের জন্য আরাকানের গভর্নর ঘা-থান-ডিকে চল্লিশ হাজার সৈন্য ও চল্লিশ হাজার মুদ্রা প্রেরণের জন্য নির্দেশ জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে বর্মী সৈন্যদের লুণ্ঠনের ফলে ও উদ্বাস্তু হয়ে আরাকানীদের পালিয়ে যাবার ফলে দাবীর এক-দশমাংশ পূরণের ক্ষমতাও ঘা-থান-ডি এর ছিল না। তবুও গভর্নর ঘা-থান-ডি দাবির অর্ধেক পূরণের চেষ্টা করবেন বলে রাজা ভোদাপায়াকে অবহিত করেন। এতে রাজা ভোদাপায়া সন্তুষ্টির ভান করে ঘা-থান-ডির জ্যেষ্ঠ সন্তানকে স্বপরিবারে বার্মার রাজ দরবারে আমন্ত্রণ জানান। ঘা-থান-ডি এর জ্যেষ্ঠ সন্তান স্বপরিবারে রাজদরবারে পৌছলে রাজা ভোদাপায়া সকলকে বন্দী করে নির্বিচারে হত্যা করে এবং দাবি অনুযায়ী অর্থ ও জনবল প্রেরণ করতে ব্যর্থ হলে সবাইকে একে একে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। ফলে ঘা-থান-ডি এক বিরাট অনুচর বাহিনী নিয়ে স্বপরিবারে আরাকান ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন।

বার্মার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ হতে জানা যায়, ১৭৮৪ সাল হতে ১৭৯৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে আরাকানের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ আরাকান ছেড়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘা-থান-ডি এর আগমনের পর আরাকানী বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আরাকানীদের মুক্তিযুদ্ধ জোরদার হয়। ঘা-থান-ডির মৃত্যুর পর তৎপুত্র সিন-পিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেন এবং আরাকানীদের মুক্তিযুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সময় বৃটিশদের সকল বর্ণনায় সিন-পিয়াকে কিং-বেরিং নামে অভিহিত করা হয়েছে। সম্ভবতঃ সিন-পিয়া রাজা উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে কিং বিয়ারিং (King Bearing) শব্দটি বিকৃত হয়ে কিং বেরিং-এ পরিণত হয়।

একের পর এক সিন-পিয়ার আক্রমণে বর্মী বাহিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। বৃটিশ ও বার্মার মিলিত শক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করেও সিন-পিয়াকে বন্দী করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতজানু নীতি বর্মী সরকারকে কিরূপ বেপরোয়া করে তুলেছিল তার একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা হলোঃ চট্টগ্রাম শহরে ডঃ ম্যাকরাই নামে জনৈক সিভিল সার্জন একটি মর্গ উদ্বাস্তু কলোনীতে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি একজন জাহাজ নির্মাতা ছিলেন। তার জাহাজ নির্মাণ স্থানে প্রায় সতেরটি কামান রাখা হয়েছিল। একরাতে সিন-পিয়া অতর্কিতভাবে এসে কামানগুলো নৌকায় করে নিয়ে পালিয়ে যায়। বর্মী সরকার তৎজ্জন্য ডঃ ম্যাকরাইকে শাস্তি গ্রহণের জন্য তাদের কাছে হস্তান্তর করার জন্য কোম্পানি সরকারের কাছে দাবি জানা এবং শেষ পর্যন্ত বার্মা সরকার এই দাবি হতে পিছপা হয়নি।

১৮১১ সালের মে মাসে প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী বাহিনী নিয়ে সিন-পিয়া অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মংডু দখল করেন এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য শ'খানেক বিদ্রোহী রেখে বাকি বিদ্রোহীদের তিনি আরাকানের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেন। এই সময় সিন-পিয়া কোম্পানি সরকারের ভূখন্ডে বসবাসরত সকল আরাকানীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ জারি করেন এবং যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করবেন না তাদের হত্যা করা হবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করেন। সিন-পিয়ার এই বেপরোয়া আক্রমণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার সম্ভাব্য বর্মী আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। কোম্পানি সরকার একদল সৈন্যবাহিনীসহ চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পি ডব্লিউ পিসেলকে সিন-পিয়াকে বন্দী করার জন্য সীমান্তে প্রেরণ করেন। এ সময় সিন-পিয়ার ভয়ে দলে দলে উদ্বাস্তুরা

আরাকানের উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকে। উদ্বাস্তুদের ধারণা সিন-পিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র আরাকানের ক্ষমতা দখল করে নেবেন। আরাকানের দিকে ধাবমান এরূপ একদল উদ্বাস্তুর সাথে টেকনাফ সীমান্তে ম্যাজিস্ট্রেট পিসেলের দেখা হয়। বিদ্রোহী উদ্বাস্তুগণ পিসেলকে বলেন, "আমরা যদি তাড়াতাড়ি গিয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান না করি তাহলে আমাদের রাজা আমাদের হত্যা করবে।" তারা আরও জানান যে, "তাদের রাজা আরাকানের কয়েকটা থানা ইতিমধ্যে দখল করে ফেলেছেন এবং আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে (অর্থাৎ ২১শে মে, ১৮১১ তাং) আরাকানের রাজধানী ম্রোহং দখল করে ফেলবেন।"

প্রকৃতপক্ষে আরাকানীদের এই আশাবাদে যুক্তি ছিল। সকল আরাকানীরা সিন-পিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বর্মী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৮১১ সালোর জুনমাসের মধ্যেই রাজধানী ম্রোহং ছাড়া সমস্ত আরাকান সিন-পিয়ার দখলে আসে। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন যুদ্ধের তীব্রতা কমে আসে। তথাপি শহরের বাইরে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং সিন-পিয়ার বিদ্রোহী বাহিনী ম্রোহং শহর অবরোধ করে রাখে।

এই সময় সিন-পিয়ার বিদ্রোহী বাহিনীর গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে যায়। তিনি কোম্পানি সরকারের কাছে চিঠি লিখে জানান যে, বর্মীদের পতন অনিবার্য এবং এটি সময়ের ব্যাপার মাত্র। তিনি বৃটিশদের কাছে আবেদন করেন যে, তাকে যদি কোম্পানি সরকার গোলা বারুদ দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে তিনি বৃটিশদেরকে কর প্রদান করবেন। কিন্তু চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জানিয়ে দেন যে, বার্মার বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে কোম্পানি সরকার আগ্রহী নয়। বিদ্রোহী বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য সিনপিয়া প্রচার করেন যে, তার পক্ষে কোম্পানি সরকারের সমর্থন আছে। এই সময় ম্রোহং শহরের বিভিন্ন দুর্গে আত্মগোপনকারী বর্মী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে সিনপিয়া প্রচার করেন যে, সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের ক্ষমা করা হবে এবং মুক্তি দেয়া হবে, অন্যথায় সকলকে হত্যা করা হবে। সিন পিয়ার এই প্রচারণায় ভীত কিছু দুর্গের সৈন্যরা আত্মসমর্থন করলে মগ বিদ্রোহীরা তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে বর্মীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এমনকি স্থানীয় জনগণকেও বিদ্রোহীরা নির্বিচারে হত্যা করেন; বিদ্রোহীরা নর-নারী-শিশু নির্বিশেষে মানুষের মাথা বর্শার মাথায় বিধে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে আনন্দোল্লাস করে। এতে আরাকানের জনগণ বিদ্রোহীদের ভয়ে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে।

বর্মী সরকার সকল বিদ্রোহী কর্মকান্ডের জন্য বৃটিশদের দায়ী করে। ভীত কোম্পানি সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন কেনিং (Captain Canning)-কে বিশেষ দূত হিসেবে বার্মার রাজধানী আভা-তে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ক্যাপ্টেন কেনিং বর্মী সরকারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, আরাকানীদের বিদ্রোহ স্তব্ধ করার জন্য কোম্পানি সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে একটি সুপ্ত আকাংখা বর্মী সরকারের মনে সদা জাগরুক ছিল। বর্মী সরকার মনে করে বাংলাদেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কেননা, বর্মী সরকারের মতে এককালে ঢাকা হতে দক্ষিণ বাংলা আরাকান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তাই কোম্পানি সরকার থেকে বাংলাদেশ ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে মনে মনে বর্মী সরকার এগোতে থাকে।

বর্ষাশেষে শীত মৌসুম আসলে পর আরাকানের হারানো ভূমি উদ্ধারের জন্য বর্মী সরকার সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরুকরে। বর্মী সরকার বৃটিশদেরকে আরাকান অভিযানে সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান। ভীত কোম্পানি সরকার টেইলর (Taylor) এর নেতৃত্বে একটি যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে আরাকান অভিযানের জন্য বর্মীদের সাহায্য করেন। বর্মী সরকার সারাদেশ ব্যাপী প্রত্যেক পরিবারকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একজন যুবক অথবা দুইশত পঞ্চাশ টাকা, একটি বন্দুক, দশটি চকমকি পাথর, দুই সের বারুদ, সম ওজনের সীসা, দুইটি কুঠার, দশটি লম্বা পেরাগ ইত্যাদি সরবরাহের জন্য নির্দেশ জারি করে।

১৮১১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর বর্মী বাহিনী সমুদ্রপথে আরাকানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। চেদুবাতে সিন পিয়ার বিদ্রোহীদের সাথে বর্মী সৈন্যের মুখোমুখি হয়।তৎকালীন সময়ের আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর ধনুক ও বাঁশের তৈরি বর্শা দিয়ে আরাকানীরা বর্মী সৈন্যদের মোকাবিলা করতে থাকে। আধুনিক মারণাস্ত্রেরমুখে পরাজয় বরণ করে সিন পিয়া পুনরায় পালিয়ে কোম্পানি এলাকার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যাহোক, সিন পিয়াকে বন্দী করার কৌশল হিসাবে বৃটিশ সরকার কৌশলে সিন পিয়ার পরিবারকে বন্দী করেন এই আশায় যে, পরিবারের স্বার্থে সিনপিয়া আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু বৃটিশদের কৌশল ব্যর্থ হয়। বৃটিশ ও বর্মী উভয় সরকারের বিরুদ্ধে অমিততেজী সিন পিয়া বিদ্রোহী কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে।

অস্বাস্থ্যকর ও বিপদ সংকুল পরিবেশে এক বিশ্বস্ত অনুচর বাহিনী নিয়ে গভীর জঙ্গলের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছোটাছুটি করতে করতে ১৮১৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি বর্তমান কক্সবাজার শহরের অদূরে সিন পিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

সিন পিয়ার মৃত্যুর পর আরাকানীদের বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলা-বার্মা সীমান্তে বর্মী সৈন্যদের উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এই তৎপরতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বর্মী সৈন্যরা বহুবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সরকারি কাজে নিয়োজিত হস্তী শিকারীদের বন্দীকরে নিয়ে যায়। এদের অনেককে হত্যা করে ও দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়। বহুবার বর্মী সৈন্যরা টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে গ্রামবাসীদের উপর চড়াও হয়ে মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং হত্যা করে। পরবর্তীতে আরাকানের বর্মী গভর্নর টেকনাফ সংলগ্ন শাহপরীর দ্বীপ বার্মার অংশ বলে দাবি করে। শুধু তাই নয় চট্টগ্রাম জেলা ও মনীপুরের উত্তর সীমান্ত বার্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বার্মা সরকার দাবি তুলে। ১৮২৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর এক হাজার বর্মী সৈন্য অতর্কিতে শাহপরীর দ্বীপ দখল করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের নিয়োজিত গার্ডদের বন্দী করে, লোকজনদের মারধর করে ও হত্যা করে। সকল লোকজনকে শাহপরীর দ্বীপ হতে তাড়িয়ে দেয়। এ সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছলে কোম্পানি সরকার একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কোম্পানি সরকারের সৈন্য ঘটনাস্থলে পৌছার পূর্বেই বর্মী সৈন্যরা শাহপরীর দ্বীপ হতে চলে যায়। এর কিছুদিন পর বর্মী সরকার বৃটিশদের তাড়িয়ে শাহপরীর দ্বীপ দখলের জন্য আরাকানের গভর্নরের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করেন এবং শাহপরীর দ্বীপ এর দখল বুঝে নেয়ার জন্য 'আভা'র কমিশনারকে প্রেরণ করেন।

প্রথম এংলো-বার্মা যুদ্ধ

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখযোগ্য ১৮১৯ খৃস্টাব্দে বার্মার রাজা ভোদাপায়ার মৃত্যুর পর ভোদাপায়ার দৌহিত্র 'বাজীড' (Bagyidaw) বার্মার ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বার্মার স্বনামধন্য সেনাপতি মহাবান্দোলাকে আরাকানে পোস্টিং দিয়ে চট্টগ্রাম আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ ঘটান। অতপর ১৮২৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহাবান্দোলা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে টেকনাফ

সীমান্ত আক্রমণ করে রামু পর্যন্ত দখল করে নেন। রামুতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন মর্টন (Captain Morton) তিনশত নেটিভ পদাতিক বাহিনী নিয়ে অগ্রসরমান বর্মী বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু দশ হাজার সৈন্যের বর্মী সৈন্যরা ক্যাপ্টেন মর্টেনকে পরাজিত করেন ও হত্যা করেন। এই পরাজয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কোম্পানি সরকার মহাবন্দোলার সমরশক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। মাত্র দুইটি বন্দুক ও তিনশত সৈন্য নিয়ে এক বড় আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন মর্টেনকে যুদ্ধে পাঠানোটাই ছিল অযৌক্তিক।

প্রকৃতপক্ষে বর্মী সৈন্যদের যুদ্ধ কৌশল ছিল বাংলা-বার্মার দুর্গম পার্বত্য সীমান্তের মধ্যে সহজেই যাতায়াত করা যায় এমন পথ দিয়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করা ও চট্টগ্রামের দিকে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখা। পক্ষান্তরে কোম্পানি সরকারের কৌশল ছিল সমুদ্র পথে আরাকান এবং রেংগুন থেকে মূল বার্মার ইরাবতী নদীর অববাহিকায় আক্রমণ পরিচালনা করা। বৃটিশদের এভাবে আক্রমণ পরিচালনার কারণ ছিল এতে বর্মী সরকার মূল ভূখন্ড রক্ষার্থে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী পিছনে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবেন। যাহোক একদল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরাকান আক্রমণ করার জন্য জেনারেল মরিসনকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং মূল বার্মার ইরাবতী উপত্যকায় আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য এগার হাজার পাঁচশত সৈন্য দিয়ে জেনারেল স্যার আর্কিবল্ড ক্যাম্পবেল (General Sir Archibiald Campbell) কে দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৮২৫ সালের জানুয়ারি মাসে জেনারেল মরিসনের কর্তৃত্বাধীন সৈন্য বাহিনীর একটি অংশ কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে কমডোর হাইস এর নেতৃত্বে নৌবাহিনীর একটি ফ্লোটিলা অপেক্ষা করছিল। সৈন্যরা স্থল ও নৌপথে চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে টেকনাফ গিয়ে সমবেত হন। টেকনাফ এসে জেনারেল মরিসনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে আক্রমণের জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল মরিসন, যিনি আরাকানের প্রথম শত্রু অবস্থান মংডু আক্রমণ করবেন এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এর নেতৃত্বাধীন অপরদল সমুদ্রের উপকূলে অবস্থান নিয়ে বর্মী সৈন্যদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ পরিচালনা করবেন।

১৮২৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি জেনারেল মরিসন মংডুস্থ বর্মী সেনা অবস্থানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করার আগেই বর্মী সেনাবাহিনী অবস্থান

ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে বহু পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী, যুদ্ধের জন্য ব্যবহারযোগ্য বহু নৌকা (তন্মধ্যে একটি ছিল নব্বই ফুট লম্বা) এবং একটি ছোট যুদ্ধ জাহাজ বৃটিশ সৈন্যদের দখলে চলে আসে। বর্মী সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পালিয়ে যায়। ১৮২৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কমডোর হাইস নদীপথে এবং জেনারেল মরিস সমুদ্রপথে আকিয়াবের দিকে অগ্রসর হন। কোন যুদ্ধ ছাড়াই বৃটিশ বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে এবং বৃটিশদের আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই বর্মী সৈন্যরা পিছনের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ১৮২৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বর্মী সরকার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বেই সমগ্র আরাকান কোম্পানি সরকারের দখলভুক্ত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বর্মী সরকার আরাকান, আসাম ও মনিপুর হতে দাবি প্রত্যাহার করে নেয়।

অপরপক্ষে, জেনারেল স্যার আর্কিবল্ড ক্যাম্পবেল এর নেতৃত্বে এগার হাজার পাঁচশত সৈন্য বাহিনীর একটি দল রেংগুন অবতরণ করেন ও বিনা যুদ্ধে রেংগুন দখল করে নেন। বৃটিশ আক্রমণের সাথে সাথে বর্মী সৈন্যরা পিছু হটে গিয়ে কিমিনডং নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। বৃটিশবাহিনী পরে কিমিনডং আক্রমণ করেও দেখতে পেলেন বর্মী সৈন্যরা এই স্থান ছেড়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বৃটিশ বাহিনী মনিপুর ও আসাম থেকেও বর্মী সৈন্যদের তাড়িয়ে দেয়। বৃটিশ সৈন্যরা টেভয়, মারগুই, মারতা বান ও পেগু দখল করে নেন। এ সময় বর্মী সরকার সন্ধি প্রস্তাব করেন। বৃটিশদের তরফ থেকে সন্ধির শর্ত দেয়া হয় ঃ (ক) বর্মীদের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিশ লাখ পাউন্ড দিতে হবে এবং (খ) আরাকান, টেভয় ও মারগুই হতে বর্মীদের দাবি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু বর্মী সরকার শর্ত মানতে রাজি না হলে পর জেনারেল ক্যাম্পবেল মেডি, মালউইন ও প্যাগান দখল করে বর্মী সরকারের রাজধানী আভার সন্নিকটে উপস্থিত হন। ফলে বার্মার রাজা সকল শর্ত মেনে সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজি হন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮২৬ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে ১৮২৪-১৮২৬ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধে আরাকান, টেনাসারিয়াম বৃটিশ দখলভুক্ত হয়। অন্য দখলভুক্ত স্থান বৃটিশ ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে বর্মী সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়।

১৮৫২ সালের দ্বিতীয় এংলো-বার্মা যুদ্ধ

সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও বর্মী সরকার বৃটিশদের কাছ থেকে হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বার্মার রাজা বৃটিশদের শক্তির তোয়াক্কা না করে পেগুর গভর্নরকে বৃটিশদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে নির্দেশ

দেন। পেগুর গভর্নর বৃটিশদের সাথে অসদাচরণ করলে কোম্পানি সরকার এর প্রতিকারের জন্য বার্মার রাজাকে অনুরোধ জানান, কিন্তু কোন ফল হয় না।

ফলে লর্ড ডালহৌসী কমডোর লামবার্ট এর নেতৃত্বে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন এবং পেগুর গভর্নরকে পদচ্যুত করার জন্য হুমকি দেন। কিন্তু বর্মী গভর্নর পেগুর গভর্নরকে পদচ্যুত করে বৃটিশদের আক্রমণ করার জন্য একটি সৈন্যদলসহ পরবর্তী গভর্নরকে পেগুতে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে কোম্পানি সরকার আরও শক্তিশালী সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং পুনরায় রেংগুন, মার্তাবান, প্রোম ও পেগু দখল করে নেন এবং আর্থার পিয়ারীকে পেগুর প্রথম বৃটিশ কমিশনার নিযুক্ত করেন।

১৮৮৫ সালের তৃতীয় এংলো-বার্মা যুদ্ধ

১৮৭৮ সালে রাজা থিব বার্মার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বৃটিশদের অগোচরে ফ্রান্স সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্যারিসে দূত প্রেরণ করেন। দূতের মাধ্যমে রাজা থিব বৃটিশদের তাড়াবার জন্য যেকোন শর্তে তাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু প্যারিসস্থ বৃটিশ দূত এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তথাপি রাজা থিব ফরাসী সাহায্যের ব্যাপার এত নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বৃটিশদের কাছ থেকে অধিক অর্থ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রকাশ্য শত্রুতার সূত্রপাত করেন। রাজা থিব বোম্বে-বার্মা ট্রেডিং কর্পোরেশনকে আটাশ লাখ টাকা জরিমানা করেন। ফলে বৃটিশ গভর্নর জেনারেল ১৮৮৫ সালের ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে এই দাবি প্রত্যাহারের জন্য হুঁশিয়ারি প্রেরণ করেন। কিন্তু বর্মী সরকার এতে কোন কর্ণপাত না করলে বৃটিশ জেনারেল প্রেনডারগাস্ট (General Prendergest) ১৮৮৫ সালের ১৪ই নভেম্বর মান্দালয় অবরোধ করেন এবং ১৫ দিনের মধ্যেই রাজা থিব আত্মসমর্পণ করেন। বৃটিশ সরকার তাকে ভারতে নির্বাসিত করেন। অতঃপর সমগ্র বার্মা বৃটিশ দখলে চলে আসে।

অতএব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অতীতে যতবার বাংলা-বার্মা বিরোধ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে ততবারই আরাকান বাংলাদেশের দখলে চলে এসেছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, আরাকানের উপর বর্মীদের দখলদারিত্বকে কেন্দ্র করেই বর্মী সৈন্যরা সীমান্তে উস্কানিমূলক তৎপরতা চালিয়েছে এবং এর পরিণতিতে বাংলা-বার্মা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

রোহিঙ্গা জাতির স্বাধীকার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত

বৃটিশ শাসনকালে বার্মার কাঠামোগত পরিবর্তন

১৮৮৫ সালে সংঘটিত তৃতীয় এংলো-বার্মা যুদ্ধে বর্মী রাজার সর্বশেষ সেনাবাহিনী বৃটিশ বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে পর সমগ্র বার্মা বৃটিদের দখলে চলে আসে। উল্লেখ্য, ১৮২৪-২৬ সালের প্রথম এংলো-বার্মা যুদ্ধে আরাকান ও টেনাসারিয়াম বর্মীদের দখলমুক্ত হয়ে বৃটিশদের দখলে আসে। ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় এংলো-বার্মা যুদ্ধে পেগু বৃটিশদের দখলে আসে। প্রকৃতপক্ষে বর্মী সৈন্যদের স্বেচ্ছাচারিতা, বর্বরতা ও বাংলা-বার্মা সীমান্তে একগুঁয়েমি আচরণ থেকে এংলো-বার্মা যুদ্ধের সূত্রপাত এবং এর ফলশ্রুতিতে বর্মীদের হারাতে হয় স্বাধীনতা। সাধারণ অর্থে আরও বলা যেতে পারে, আরাকানে বর্মী বাহিনীর দখলদারিত্বকে কেন্দ্র করে এংলো-বার্মা যুদ্ধের সূচনা ও বর্মীদের করুণ পরিণতি ঘটে।

যাহোক, বার্মায় বৃটিশ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পর বার্মার প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অনেক কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমতঃ সমগ্র বার্মা ভারতের একটি প্রশাসনিক প্রদেশে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ বর্মী রাজাদের রাজধানী আভা (বর্তমান মান্দালয়) এর পরিবর্তে বন্দরনগরী রেঙ্গুন নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজধানীতে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ বর্মী রাজাদের কালের সামন্তবাদী কর্মকান্ডের পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হয়। বলাবাহুল্য, এ সমস্ত কাজ ছিল বর্মীদের কাছে ভীষণ অপরিচিত। ফলে প্রধানতঃ বার্মায় জনশক্তির অপ্রতুলতা এবং দ্বিতীয়তঃ কর্মের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহজনিত কারণে ভারতীয়দের জন্য বার্মায় বহুবিধ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। প্রথমে ভারতীয়রা আসে সরকারি কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর তল্পিবাহক হিসেবে। এরপর ভারত থেকে ব্যবসায়ী শ্রেণীর আগমন ঘটে। অতঃপর বন্দরের কুলি, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, রেল শ্রমিক, দোকানদার, দোকান কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক, নৌকার মাঝি, খনি শ্রমিক, রেল শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, ব্যাংক কর্মচারী, পোস্ট অফিসের কর্মচারী প্রভৃতি পেশায় বহু

ভারতীয়দের আগমন ঘটে। যেহেতু সমুদ্রপাড়ি হিন্দু ধর্মে পাপ বলে বিবেচিত হতো, ফলে এই সমস্ত বহিরাগতদের অধিকাংশই ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

উল্লেখ্য বার্মার উপর বৃটিশ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতার চেতনায় গর্বিত আরাকানীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। স্মর্তব্য, ১৭৮৪ সালে বার্মার রাজা ভোদাপায়া আরাকান দখল করে আরাকানকে বার্মার সাথে একীভূত করে বার্মার একটি প্রদেশে পরিণত করে। প্রথম এংলো-বার্মা যুদ্ধে আরাকানের মুক্তি সংগ্রামীরা বৃটিশদের পক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু বৃটিশরা বার্মা দখল করে আরাকানকে বার্মার সাথে একীভূত করে রাখে। ফলে আরাকানীদের রাজনৈতিক অবস্থান বৃটিশ শাসনকালেও অপরিবর্তিত থাকে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, আরাকানের পতিত জমি আবাদ করার জন্যে আরাকান পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ এবং পেগু পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন, ১৮৬৫ বৃটিশ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। "Waste land grants were issued by Government under the Arakan waste land grant rules of 1839 and 1841 and the pegu waste land grant rules of 1865 with the object of causing an influx of population and extension of cultivation in Arakan by new setters"[৬৬] এই অধ্যাদেশের আওতায় বৃটিশ সরকার চট্টগ্রাম থেকে বহু লোককে আরাকানে এনে পতিত জমি বিতরণ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এসব ভাগ্যাহত পরিবারসমূহ অনাহার অর্ধাহারে থেকে, পাহাড়ী রোগ ও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সাথে যুদ্ধ করে, অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রম বিনিয়োগ করে আরাকানের গভীর অরণ্য ও পতিত অঞ্চলসমূহ মানুষ বসবাসের যোগ্য করে। বিভিন্ন সূত্রে এদেরকে চট্টগ্রাম থেকে আগত বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের অধিকাংশ ছিল ১৭৮৪ সালের পর আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বংশধর। এই সমস্ত ভাসমান রোহিঙ্গাদের বংশধরেরা শুধুমাত্র আরাকানের পতিত অঞ্চল আবাদ করেনি, দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বিশাল পতিত অঞ্চল এরাই আবাদ করে বসতিযোগ্য করেছে।

উল্লেখ্য, রোহিঙ্গারা একটি ভাষাভিত্তিক জাতি গোষ্ঠী। একজন জাপানিকে যেরূপ ভাষার মাধ্যমে একজন ভিয়েতনামী থেকে আলাদা করা যায়, ঠিক তেমনি একজন রোহিঙ্গাকেও ভাষার মাধ্যমে, একজন বাঙালি, এমনকি একজন চট্টগ্রামী থেকেও পৃথক করা সম্ভব।

রোহিঙ্গারা স্বদেশের মাটিতে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে আরাকানে রোহিঙ্গাদের নৃতাত্তিক পরিচয়ের প্রধান সাক্ষী রাখাইন বা মগ সম্প্রদায়ের একটি অংশ প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গাদের বহিরাগত হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে এসেছে। বার্মার সামরিক সরকার হলো এই অপপ্রচারের প্রধান শ্রোতা। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত মুসলমানদের নেতৃত্বাধীন বার্মার মুসলমানদের স্বাধীকার আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রোহিঙ্গারা স্বতন্ত্র কোন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে রোহিঙ্গাদের স্বকীয় রাজনীতি বার্মার বহিরাগত মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর রাখাইন বা মগ অপপ্রচারকারী রোহিঙ্গা জাতির এই দুর্বল রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রোপাগান্ডার উপাদান হিসেবে অব্যাহতভাবে কাজে লাগায়।

বৃটিশ শাসনকালে বর্মী মুসলমানদের সাংগঠনিক কর্মকান্ড

(ক) বার্মা মুসলিম সোসাইটি ঃ ১৯০৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর মাসে উ বা অ (U Bah Oh) নামক রেঙ্গুনের জনৈক মুসলিম ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে বার্মা মুসলিম সোসাইটি গঠিত হয়।[৩৩] এই সংগঠনটি গঠন করার মধ্যে এক ব্যাপক রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগ থেকে বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বার্মায় মুসলমানদের সমাগম ঘটে। ফলে বহিরাগত মুসলমান ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে কেহ উর্দু ভাষায়, কেহ তেলেগু ভাষায়, কেহ বাংলা ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ তারা যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সে অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে স্থানীয় মুসলমানেরা বর্মী ভাষায় কথা বলে। পুনরায় স্থানীয় ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেখা দেয় মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে বার্মায় বসবাসরত মুসলমানদের বার্মার পরিবেশের অনুকূল একটি অভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্যই গঠিত হয় বার্মা মুসলিম সোসাইটি।

বার্মা মুসলিম সোসাইটি বহু বছরকাল বার্মার মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বৃটিশ সরকার কর্তৃক

গঠিত বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটিসমূহে এই সোসাইটি বার্মার মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে বহু দেন দরবার করেন। ১৯১৬ সালে এবং ১৯১৭ সালের শেষভাগে লর্ড চেমসফোর্ড (Lord Chelmsford) ভারত শাসন আইন সংস্কারের লক্ষ্যে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বার্মা আসলে, বার্মা মুসলিম সোসাইটির নেতৃবৃন্দ তাকে বার্মার মুসলমানদের পক্ষে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন এবং আইন পরিষদে (Legislative Council) মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগদানের অনুরোধ জানান। অতঃপর সাইমন কমিশন সমীপেও এই সোসাইটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মরণ করা যেতে পারে, ভারত শাসন আইনের অধীনে সাইমন কমিশন গঠিত হয়। ১৯২০ সাল থেকে এই কমিশন কার্যকর হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে এসে বৃটিশ সরকার শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে দ্বৈত শাসন নীতি (Dyarchy System) চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। সাইমন কমিশনের কাজ ছিল ভারত শাসন আইন, ১৯১৯-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দশ বছর পর দ্বৈত শাসন পদ্ধতি চালু করার সর্বোত্তম পদ্ধতি নির্ণয় করা। ১৯২৯-৩০ সালে এই কমিশন বার্মা সফরে গেলে বার্মা মুসলিম সোসাইটি একটি বিস্তৃত দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

এই সময় বার্মা ভারতের একটি প্রশাসনিক প্রদেশ হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বার্মাকে ভারত শাসন আইন থেকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ সরকার অনুভব করত।

বার্মার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করত ডমিনিয়ন মর্যাদা না দিয়ে বার্মাকে ভারত শাসন আইন থেকে পৃথক করা হলে বর্মীদের কোন লাভ হবে না। বরং ভারত শাসন আইনের সুফল থেকে বর্মী জাতি বঞ্চিত হবে। ১৯১৯ সালে প্রণীত মনট্যাগ ও চেমসফোর্ড রিপোর্টে, (Montague and Cholmsford report) যা ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ নামে সমধিক পরিচিত, উল্লেখ আছে যে, বার্মা ভারতের অন্তর্গত নয় বলে বার্মা এই আইনের আওতাভুক্ত হবে না। তথাপি, ১৯২৩ সালে বার্মাকে ভারত শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সালে বার্মাকে ভারত থেকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। এই নতুন পদ্ধতিতে রেঙ্গুনস্থ বৃটিশ গভর্নর জেনারেল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তাকে নয় সদস্যের

একটি কেবিনেট সহায়তা করবেন। গভর্নর নির্বাচিত প্রতিনিধি সভার পরামর্শক্রমে এদের নিয়োগ দেবেন।

যাহোক পরবর্তীতে বার্মা মুসলিম সোসাইটি বার্মায় বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য কল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করে।

(খ) বার্মা মুসলিম সংঘসমূহের সাধারণ সংস্থা

(The General Council for Burma Moslem Associations)

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বার্মায় জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে পর বার্মার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে। অতপর ১৯৪৫ সালে বার্মা হতে জাপানীদের বিতাড়নের পর বার্মার মুসলিম সংঘসমূহের সাধারণ সংস্থা বা The General Council for Burma Moslem Associations পুনর্গঠিত হয় এবং এই সংস্থা বার্মার মুসলমানদের স্বার্থ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থা ১৯৩৬ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম সোসাইটিকে সমর্থন জ্ঞাপন স্বতন্ত্র কোন কর্মসূচী সংস্থা গ্রহণ করেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্মায় বৃটিশ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে পর বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জেনারেল আউংছানের নেতৃত্বে Anti Facist Peoples Freedom League বা AFPFL সংগঠনের নামে সংগঠিত হতে থাকে। জেনারেল আউংছান ছিলেন রেঙ্গুনস্থ বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী। জেনারেল আউংছানের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বৃটিশদের কাছ থেকে সমগ্র বার্মার স্বাধীনতা দাবি করলে পর পাহাড়ী জাতিসমূহ, যথাঃ কারেন, সান, সীন, কায়া, মুন, লা-উ, কোচিন প্রভৃতি, বর্মী জাতির সাথে স্বাধীনতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। প্রত্যেক পাহাড়ী জাতিসমূহ বৃটিশ সরকারের কাছে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতার দাবি জানায়।

বলাবাহুল্য, বার্মা ও আরাকান ভারত শাসন আইন হতে পৃথক হলে পর রেঙ্গুনস্থ বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের অধীনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে শাসিত হয়। পক্ষান্তরে, পাহাড়ী জাতিসমূহ রেঙ্গুনস্থ গভর্নর জেনারেলের অধীনে হিলট্রাক্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত আইনে স্ব স্ব রাজাদের মাধ্যমে শাসিত হতো। ফলে পাহাড়ী জাতিসমূহের সাথে বর্মীদের কোন ধরনের জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত কিংবা প্রশাসনিক ব্যাপারেও কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। বরং পাহাড়ী জাতিসমূহের সাথে বর্মী জাতির ছিল সুদীর্ঘকালের বৈরিতা।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আউংছানকে সর্ববার্মার স্বাধীনতা গ্রহণের পূর্বে সকল জাতি সমূহের লিখিত আনুগত্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। ফলে ১৯৪৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি হতে ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বার্মার স্বাধীনতা গ্রহণের পূর্বে একটি সংবিধান রচনা করতে হবে এবং সংবিধানে সকল জাতির স্বতন্ত্র স্বকীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাধীন বার্মা ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উ-চান টুন ছিলেন এই সংবিধান প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা। (উ-চানটুন স্বাধীনতার পর ইউনিয়ন অব বার্মার প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সামরিক শাসক নে-উইন কর্তৃক কারাবন্দী হওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল ছিলেন।)

বার্মা মুসলিম সংঘসমূহের সাধারণ সংস্থার নেতৃবৃন্দ ১৯৪৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি বৃটিশ গভর্নর সমীপে বার্মা ইউনিয়নের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ায় বার্মার মুসলমানদের অধিকার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধিকারনামা ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন। কিন্তু বৃটিশ গভর্নর জেনারেল এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

অথচ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার ধূম্রজাল বৃটিশেরই সৃষ্টি, এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। অতঃপর সংস্থার নেতৃবৃন্দ ৪ঠা আগস্ট ১৯৪৭ সালে প্রস্তাবিত সংবিধানে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বার্মার মুসলমানদের স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে বার্মার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী উ-নূ-এর কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের ১৯শে জুলাই দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা চলাকালে জেনারেল আউংছান, উ-আবদুর রাজ্জাকসহ সাতজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে উ-নূ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের ২রা অক্টোবর সংবিধান প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা উ-চান টুন সংস্থার সভাপতি বরাবরে প্রেরিত চিঠির উত্তরে উল্লেখ করেন যে, বার্মা ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে যে সমস্ত মুসলমান বার্মায় জন্মগ্রহণ করেছে, বার্মায় লালিত-পালিত হয়েছে, বার্মায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং যাদের পিতামাতা অথবা পিতামাতার যেকোন একজন বার্মার নাগরিক তাদের সবাই বার্মার নাগরিক। সংবিধানের ১১(১) ধারা মতে সকল ব্যক্তি যাদের পিতা-মাতা উভয়ই বার্মার

যেকোন বুনিয়াদী জাতির সদস্য; ১১(২) ধারা মতে যেকোন ব্যক্তি বার্মা ইউনিয়নের অন্তর্গত যেকোন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন, যার দাদা-দাদী বা নানা-নানীর যেকোন একজন বার্মার স্বীকৃত বুনিয়াদী জাতিসমূহের কোন একটির সদস্য হলে; ১১(৩) ধারা মতে যেকান ব্যক্তি বার্মা ইউনিয়নের অন্তর্গত যেকোন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলে, তাদের পিতা-মাতার উভয়েই বার্মায় জীবিত থাকলে অথবা তাদের পিতা-মাতা এই সংবিধানে কার্যকর হওয়াকালে জীবিত থাকলে, তাদের সবাই বার্মার নাগরিক। বার্মার সংবিধান অনুযায়ী আইনের চোখে বার্মার সকল নাগরিক সমান, সকল নাগরিকদের অধিকার ও সুযোগ সমান। সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে বার্মার সকল নাগরিক ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে- আইনের চোখে সবাই সমান। সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, বার্মার যেকোন নাগরিক রাষ্ট্রের অধীন যেকোন পেশায় নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ লাভ করবেন। এছাড়াও রাষ্ট্র প্রধান হতে আইন পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের অবাধ সুযোগ থাকবে।"[১]

কিন্তু সাধারণ সংস্থার নেতৃবৃন্দ এতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে বার্মার মুসলমানগণ যেকোন আইন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার কোন সুযোগ লাভ করবে না। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে সংবিধানের ৮৭ নং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে, তদ্রূপ মুসলমানদের জন্য ও সংখ্যালঘু হিসেবে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে বার্মার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায় মুসলমানদের নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে স্মারকলিপি প্রচার করা হয়।

বার্মা মুসলিম কংগ্রেস

প্রকৃতপক্ষে বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তি যোগানোর জন্যই বার্মা মুসলিম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বার্মার মুসলমানদের এই সংগঠনটির সাথে জড়িয়ে আছে বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস।

১৯৪৫ সালে- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত জাপানীরা বার্মা ছেড়ে চলে গেলে পর বার্মা পুনরায় বৃটিশদের দখলভুক্ত হয়। অতঃপর ফ্যাসীবাদী জাপানীদের অধিকৃত বার্মায় স্থগিত থাকা সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুনরায় শুরু হয়।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে বার্মার জাতীয় নেতা জেনারেল আউংছানের নেতৃত্বাধীন এ, এফ, ও (A.F.O: Anti-Fascist Organisation) কে সম্প্রসারিত করে এ, এফ, পি, এফ, এল (AFPFL: Anti-Fascist Peoples Freedom League) গঠন করা হয়। এই এ, এফ, পি, এফ, এল বা সংক্ষেপে ফ্রিডম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল বার্মার সকল জাতি গোষ্ঠীসমূহকে একই সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা। সর্ব বার্মার স্বাধীনতার জন্যে এটি অপরিহার্য ছিল।

বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৯২০ সালের পর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বার্মার গ্রামীণ জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। কৃষকেরা কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল হতে বঞ্চিত হতে থাকে, ধানের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এই দুর্দিনে ভারত হতে সুদখোর মহাজনেরা গিয়ে গ্রাম অঞ্চলে রমরমা ব্যবসা শুরু করে দেয়। ভারতীয় মহাজনদের এই বন্ধকী ব্যবসার কারণে হাজার হাজার কৃষক স্বর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। দলে দলে কৃষকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয়। একই সাথে বর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভারতীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। বলাবাহুল্য, এই মহাজনেরা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত একটি বিশেষ শ্রেণী। কিন্তু সকল ভারতীয়রাই বর্মীদের ক্ষোভের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

দলে দলে বার্মার গ্রামের মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরে আসলে প্রত্যক্ষ করে যে, শহরের শ্রমিকদের অধিকাংশই ভারতীয় মুসলমান। ফলে বর্মীদের মনে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয় তীব্র ক্ষোভ।

এমনিভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ থেকে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধে। বার্মাকে ভারত শাসন আইন থেকে পৃথক

করার জন্যও বার্মীদের স্বদেশ শাসনের ক্ষমতা দেয়ার জন্যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠন রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করে।

বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ত্রিশ কমরেড বা Thirty Comrades:

১৯৩০সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ ছাত্র DOHBAME ASI-AYONE বা WE Burmese Association নামে একটি সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের নামের প্রথমে তাকিন (THAKIN) শব্দটি লিখত বলে জনগণের কাছে এটি তাকিন পার্টি নামে পরিচিত হয়। তাকিন শব্দের অর্থ মালিক।[২]

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পর জাতীয়তাবাদী নেতারা বার্মার স্বাধীনতার অঙ্গীকার না দিলে বৃটিশদের সমর্থন না দেয়ার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ফলে বৃটিশ সরকার অনেক জাতীয়তাবাদী কর্মীদের কারারুদ্ধ করেন। এ সময় আউংছানের নেতৃত্বে ত্রিশ সদস্যের একটি দল গোপনে জাপান পালিয়ে যায়। জাপান সরকার এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে বার্মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মী (Burma Independent Army ev B.I.A) গঠিত হয়। ১৯৪১ সালে জাপানী বাহিনীর সাথে বি, আই, এ বা Burma Independent Army বার্মায় প্রবেশ করে। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানীদের কাছে রেঙ্গুনের পতন ঘটে। একই বছর বার্মা হতে বৃটিশ শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হলে জাপান অধিকৃত বার্মার প্রশাসনিক কর্মকান্ডে বি,আই,এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২]

আরাকানের নৃশংসতম গণহত্যা

১৯৪২ সালের জুন মাসে জাপানী বিমান বাহিনী আকিয়ারের উপর প্রচন্ডভাবে বোমাবর্ষণ শুরু করে। জাপানীদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে বৃটিশ শক্তি আরাকান ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে আরাকানে এক প্রশাসনিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই সময় বার্মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মির কিছু সদস্য জাপানী সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে আরাকান আসলে আরাকানের একটি মগ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এদের অস্ত্র হস্তগত করে নেয় এবং আকিয়াব, রাছিডং, ক্যকথ, মব্রা, মিনবিয়া, পুনাজুয়ে প্রভৃতি এলাকায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর এক বেপরোয়া গণহত্যার সূচনা করে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা,

লুটতরাজ ও গ্রামের পর গ্রামের মানুষের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত মগ হামলাকারীরা ক্ষান্ত হয়নি, মৃত মানুষের মস্তক বর্ষার মাথায় বিঁধে কিভাবে তান্ডব নৃত্য করেছিল তা এখনও রোহিঙ্গা পল্লীর লোকগাঁথায় ধারণ করা আছে।

আকিয়াবের মরহুম খলিলুর রহমান, বি,এ, বি,এল তার "কারবালা-ই-আরাকান" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বার্মার স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ও আকিয়াব নিবাসী মরহুম সোলতান মাহমুদ ১৯৪২ সালের গণহত্যায় তিনশত ছিয়াত্তরটি সম্পুর্ণভাবে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া গ্রামের বর্ণনা দিয়ে বার্মার পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। উন্মত্ত মগ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আক্রমণ এড়িয়ে লাখ লাখ লোক দুর্গম 'আপক' গিরিপথ দিয়ে উত্তর আরাকানের মংডু, বুছিডং এলাকায় পালিয়ে আসার পথে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেন। তৎকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার রংপুরের সুবীর নগরে এই সমস্ত ভাগ্যাহত উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করেছিলেন। উত্তর আরাকান হতে বহুদূরে- রংপুরের সুবীর নগরে- পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি এলাকায় বহু উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন করেছিলেন, যা এখনও রিফিউজি ঘোনা নামে পরিচিত। দুঃখজনক বিষয় হলো, বার্মা সরকার এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের স্বদেশে আর ফিরিয়ে নেয়নি।

বার্মার জাতীয়তাবাদী শক্তির জাপান বিরোধিতা

বলাবাহুল্য, জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছিল বার্মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মী বা বি, আই, এ। বি,আই,এ প্রতিষ্ঠার পেছনে জাপানীদের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন সময়ে বর্মীদের মধ্যে হতে একটি সাহায্যকারী বাহিনী গড়ে তোলা। আউংছান ছিলেন এই বাহিনীর প্রধান। জাপান সরকার আউংছানের কাজে খুশী হয়ে তাকে জেনারেল উপাধীতে ভূষিত করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালে জাপানী সৈন্যদের পাশাপাশি বার্মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মী বার্মায় প্রবেশ করলে বার্মার জনগণ ভীষণভাবে গৌরবান্বিতবোধ করে। বি,আই,এ-র মধ্যে বার্মার জনগণ প্রত্যক্ষ করে নিজেদের শৌর্য-বীর্য। ফলে

বার্মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মীর সেনানায়ক আউংছান (পরবর্তীতে জেনারেল আউংছান) রাতারাতি বর্মী জাতির এক বড় নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৮৪]

কিন্তু বার্মা জাপানী সেনাবাহিনীর পরিপূর্ণ দখলে আসলে পর জাপানীদের ফ্যাসীবাদী রূপ আস্তে আস্তে জনগণের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। ফলে জাতীয়তাবাদীরা বার্মা হতে জাপানীদের বিতাড়িত করার জন্যে ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে। এই আন্দোলনের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে গঠিত হয় এ, এফ, ও বা Anti-Fascist Organisation। ১৯৪৫ সালের ১৬ মার্চ বার্মা ন্যাশনাল আর্মী (বি,আই,এ এর পরবর্তী নামকরণ) রেঙ্গুনে জাপানীদের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক যৌথ প্যারেডে অংশগ্রহণের পর মহড়া প্রদর্শনের নামে রেঙ্গুন হতে বাহির হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালের ২৭শে মার্চ বার্মা ন্যাশনাল আর্মী সারাদেশব্যাপী জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে দেয়।[৮৫]

এ সময় Willian Slim এর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনীর ইরাকী নদী অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই মে জেনারেল আউংছান বার্মা ন্যাশনাল আর্মীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঝষরস এর সাথে দেখা করেন। তিনি বৃটিশ কমান্ডারকে জাপানীদের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযানে অংগ্রহণের প্রস্তাব দেন এই শর্তে যে, বার্মা ন্যাশনাল আর্মীকে বৃটিশ বাহিনীর সাথে একটি শরিক সেনাবাহিনী হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে।

যাহোক, ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন সমগ্র বার্মা বৃটিশদের দখলে আসে এবং এই দিন রেঙ্গুনে বৃটিশ বাহিনীর বিজয়ী প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এ বিজয়ী প্যারেডে বার্মা ন্যাশনাল আর্মীও অংশগ্রহণ করে।[৮৬]

জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের সর্ববার্মা ভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ

১৯৪৫ সালের মে মাসে বৃটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্রের মাধ্যমে বার্মা সম্পর্কে সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, বার্মায় সম্পূর্ণভাবে আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হলে পর একটি সর্বজনসম্মত সংবিধান রচনার পর বার্মাকে ডমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status) দেয়া হবে। কিন্তু সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ীজাতিসমূহ বার্মার সাথে স্ব ইচ্ছায় যোগদান করতে না চাইলে এ সমস্ত এলাকাসমূহ বার্মার ডমিনিয়ন মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৮৭]

এমতাবস্থায় বার্মা পুনরায় বৃটিশ দখলভুক্ত হলে পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সর্ববার্মা ভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। এরই ফলশ্রুতিতে জেনারেল আউংছান ন্যাশনাল আর্মী থেকে পদত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং Anti-Fascist Freedom Organisation কে সর্ব বার্মাভিত্তিকরূপ দেয়ার জন্য AFPFL বা Anti-Fascist Peoples Freedom League প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় জেনারেল আউংছানকে রেঙ্গুনস্থ বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের অধীনে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

বার্মা মুসলিম কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ

জেনারেল আউংছান Anti-Fascist Peoples Freedom League কে শক্তি যোগানোর জন্যে ও সর্ববার্মা ভিত্তিক রূপ দেয়ার জন্যে এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সিয়াজী উ-আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বার্মা মুসলিম কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করে। বলাবাহুল্য, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে Anti-Fascist Peoples Freedom League আত্মপ্রকাশ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উ-আবদুর রাজ্জাক মান্দালয়ের জনৈক স্কুল শিক্ষক। পরে তিনি স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্মী ভাষায় উ-এর অর্থ হলো জনাব। বার্মার নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। জেনারেল আউংছানসহ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি সিয়াজী উ-আবদুর রাজ্জাক নামে খ্যাত। বর্মী ভাষায় সিয়াজী শব্দের অর্থ মহান শিক্ষক। জেনারেল আউংছানের অন্তর্বর্তী কালীন সরকারের শিক্ষা ও পরিকল্পনামন্ত্রী হিসেবে সিয়াজী উ-আবদুর রাজ্জাক দায়িত্ব পালন করেন।

জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে উ-আবদুর রাজ্জাক উত্তর বার্মায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। ছাত্রদেরকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করতে তার ছিল ক্লান্তিহীন প্রয়াশ। তিনি তার স্কুলের সিলেবাসের মধ্যে সামরিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি মান্দালয় জেলার AFPFL এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪৫ সালের ২৪-২৬শে ডিসেম্বর AFPFL প্রতিষ্ঠার চার মাস পর, উ-আবদুর রাজ্জাক সর্ববার্মা ভিত্তিক মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্ভবত AFPFL এর এটিই সর্ববার্মা ভিত্তিক প্রথম রাজনৈতিক কর্মকান্ড। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ছিল বার্মার মুসলমানদের সকল সংগঠনসমূহকে 'বার্মা মুসলিম কংগ্রেস' নামক একটিমাত্র সংগঠনের অধীনে একীভূত করা এবং বার্মা মুসলিম কংগ্রেসের মাধ্যমে সকল মুসলমানদের বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিন্ন স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা।

এই সম্মেলনেই বার্মা মুসলিম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সংগঠনকে AFPFL এর অংগ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। সিয়াজী উ-আবদুর রাজ্জাককে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ববার্মার বাইশটি শহরে এর শাখা বিস্তৃত হয়।

মুসলিম বণিক শ্রেণী ও রেঙ্গুন চেম্বার অব কমার্স

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বার্মায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রেঙ্গুন কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক কর্মকান্ড দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ ধরনের কাজ বর্মীদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় মুসলমানদের হাতে চলে আসে। অতএব ভারতীয় মুসলমানেরাই ছিল রেঙ্গুন চেম্বার অব কমার্স এর মূল চালিকা শক্তি।

বলাবাহুল্য, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে সেনাবাহিনী হতে পদত্যাগ করে জেনারেল আউংছান AFPFL গঠন করে পরিপূর্ণভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। এ সময় দলের সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে দারুণ অর্থ সংকট দেখা দেয়। জেনারেল আউংছান ভারতীয় মুসলিম অধ্যুষিত রেঙ্গুন চেম্বার অব কমার্স এর নেতৃবৃন্দকে AFPFL এ যোগদান করতে অনুরোধ জানান। তিনি মুসলিম বণিকদের নিশ্চয়তা দান করেন যে, স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় মুসলমানদের স্বার্থ ও নাগরিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত হবে। স্বাধীনতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি আরও জানান যে, স্বাধীনতা অর্জিত হলে ভারত হতে আগত বার্মার নাগরিকেরা বর্তমান সময়ের চাইতে অধিক বেশি নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে।

ত্রিশ বছরের তেজোদীপ্ত যুবক জেনারেল আউংছানের কথায় রেঙ্গুন চেম্বার অব কমার্সের বণিকেরা বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং চেম্বার অব কমার্সকে

অঋচঋখ এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেন। স্মরণ করা যেতে পারে, বর্মীরা সাধারণভাবে বার্মায় বসবাসকারী ভারত বংশোদ্ভোদ- যাদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান- জনগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত ও বিক্ষুব্ধ ছিল। বার্মার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদগণ এক কালে এই ক্ষোভ সৃষ্টির পেছনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। নিঃসন্দেহে চেম্বার অব কমার্সের মাধ্যমে AFPFL এ যোগদান করে ভারত বংশোদ্ভোদ বণিক সম্প্রদায় স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় রাজনৈতিক রোষানল থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল, যা স্বাধীন বার্মায় বাস্তবায়িত হয়নি।

সিয়াজী উ-আবদুর রাজ্জাকের রাজনৈতিক চিন্তাধারা :

বার্মা মুসলিম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে উ-আবদুর রাজ্জাক বার্মায় বসবাসরত ও ভারত হতে আগত মুসলমানদের বার্মার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য প্রদর্শনের পরামর্শ দেন। ভারত হতে আগত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি আর ও পরামর্শ দেন যে, তাদের জন্য উচিত হবে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হওয়া।

উ-আবদুর রাজ্জাক GCBMA বা General Council of Burma Moslem Associations কর্তৃক বার্মার সংবিধানে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার ঘোষণার দাবিকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলমানেরা স্থায়ীভাবে বার্মার মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি GCBMA কেও মুসলিম কংগ্রেসের পদাংক অনুসরণ করে AFPFL এ যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। উ-রাজ্জাক ভারত হতে আগত মুসলমানদের বার্মার একটি শক্তিশালী ও সম্মানিত জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আহ্বান জানান।

দূর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৪৭ সালের ১৯শে জুলাই, সর্ববার্মার স্বাধীনতা লাভের মাত্র পাঁচ মাস পূর্বে, AFPFL এর এক গুরুত্বপূর্ণ দলীয়সভায় আততায়ীর গুলীতে জেনারেল আউংছান, উ-আবদুর রাজ্জাকসহ প্রথম কাতারের সাতজন নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

বার্মা মুসলিম কংগ্রেস বনাম বার্মা মুসলমানদের সংঘসমূহের সাধারণ সংস্থা

মুসলিম কংগ্রেস ও সাধারণ সংস্থার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৃটিশদের কাছ থেকে সর্বভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে। কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি অংশ স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকারের ঘোষণা দাবী করে। এ দাবীর ভিত্তিতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা আশরাফ আলী থানভী, মওলানা আবুল আ'লা মুওদুদীসহ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আরও অনেক স্বনামধণ্য নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম এক হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান।

পক্ষান্তরে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশ মুসলিম লীগের অধীনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শরীক হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মুসলিম প্রধান প্রদেশদ্বয়ে মুসলিম লীগের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এ সময় কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ করে মুসলমান বিরোধী ও হিন্দুবাদী সাম্প্রদায়িকতার এক জঙ্গীরূপ। ফলে, ১৯৪০ সাল থেকে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশন প্ল্যানের মাধ্যমে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার পুনরায় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই কেবিনেট মিশন প্লানের প্রতি সমর্থন জানান। কিন্তু, পরবর্তীতে কংগ্রেসের হিন্দুবাদী নেতৃত্বের কারণে এই প্লান ব্যর্থ হয় এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভুমির রাজনীতি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়।[৩৩]

যাহোক, ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেস কেন্দ্রীক রাজনীতি আমাদের বার্মা মুসলিম কংগ্রেসের রাজনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের রাজনীতি আমাদের GCBMA বা বার্মা মুসলমানদের সংঘসমূহের সাধারণ সংস্থার রাজনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৃটিশ ভারতে মুসলিম লীগের রাজনীতি পূর্ণতা পেয়েছে এবং বৃটিশ বার্মায় মুসলিম কংগ্রেসের রাজনীতি পূর্ণতা পেয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে GCBMA এর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নেই বার্মার মুসলমানদের কল্যান নিহিত ছিল।

ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয় হলো, বৃটিশ ভারতে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।

ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলন ও আজকের সংখ্যালঘু সমস্যা

১৯৪৬ সালের মধ্যভাগে এসে জেনারেল আউংছান বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এটলীর সাথে গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বাধীন AFPFL সরকারের অধীনে সর্ববার্মার স্বাধীনতা হস্তান্তরের দাবি জানান। কিন্তু বার্মার স্বাধীনতার প্রশ্নে অনুষ্ঠিত এই গোল টেবিল বৈঠকের আগেই পাহাড়ী জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দ, যথা শান, কারেন, কায়া, মুন, সিন, কাচিন প্রভৃতি, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বর্মী জাতির সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা গ্রহণে অ-স্বীকৃতি জানান।

স্যার এটলি বর্মীনেতার সর্ববার্মার স্বাধীনতার দাবিকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে সংখ্যালঘূদের সম্মতি প্রয়োজন হবে বলে তাকে অবহিত করেন। তাই, সকল জাতিসমুহের একটি ঐক্যবদ্ধ সম্মতি লাভের জন্য ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলনের আহ্বান করা হয়।

প্যানলং বার্মার শান স্টেট এর অন্তর্গত একটি পার্বত্য শহর। ১৯৪৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি প্যানলং সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। জেনারেল আউংছান পাহাড়ী জাতিসমুহের প্রতিনিধিদের একথা বুঝাতে সমর্থ হন যে, শান, কাচিন, সীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা দ্রুততার সাথে অর্জন করা সম্ভব হবে, যদি তারা বার্মার অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রতি সহযোগিতা করে। আউংছান সর্ববার্মার ঐক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ঐক্য অর্থে মনে করা হবে বিভিন্নতার মাঝে ঐক্য- Unity in the diversity।

জেনারেল আউংছান আরও ঘোষণা দেন যে প্রত্যেক জাতি স্ব-স্ব এলাকায় নিজেদের প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হবে, প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় অধিকার, সংস্কৃতিক ও ভাষা অক্ষুন্ন থাকবে। সম্মেলনে শান এবং কায়া স্টেটকে এই অধিকার দেয়া হয় যে, স্বাধীনতার পর দশ বছর পরীক্ষামূলকভাবে ফেডারেল সরকারের অধীনে থেকে যদি ইচ্ছা করে শান এবং কায়া স্টেট স্বাধীন হয়ে যাওয়ার অধিকার পাবে।

পাহাড়ী জাতিসমুহের নেতৃবৃন্দ বর্মী নেতাদের সকল আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং ঐক্যবদ্ধ বার্মার স্বাধীনতায় সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। সম্মেলন

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সর্ববার্মার স্বাধীনতার সনদ গ্রহণের পূর্বে প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকে এমন একটি সংবিধান রচনা করতে হবে। এই সংবিধানের প্রতি আনুগত্য নিয়েই স্বাধীনতার সনদ হস্তান্তরের কাজ সমাধা করতে হবে।

যাহোক, প্যানলং সম্মেলনের সফল সমাপ্তির পর AFPFL এর নেতৃত্বে বার্মার স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এরপর থেকে বর্মী নেতারা ভিন্ন চিন্তা শুরু করে দেয়।

কিছু কিছু বর্মী নেতা মনে করে যে, বার্মার জাতিগত বিভক্তিসমূহ বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির সৃষ্টি। এই চিন্তার নেতারা মনে করে সর্ববার্মার সকল জাতিসমূকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি সহজপথ হলো, সর্ববার্মার জন্যে একটি অভিন্ন ভাষা, অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি এবং একটি সাধারণ জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলে সকলকে অভিন্ন ধারায় ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এই চিন্তার নেতৃবৃন্দের মতে অভিন্ন ধারা সৃষ্টির পর এক পর্যায়ে পরবর্তী প্রজন্ম বিভিন্নতা থেকে উঠে এসে একটি সাধারণ জাতীয় ধারায় ঐক্যবদ্ধ হবে। প্রধানমন্ত্রী উ-নূ সহ AFPFL এর আউংছান পরবর্তী নেতৃবৃন্দ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

অধুনা বার্মার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শসস্ত্র সংখ্যালঘূ জাতি গোষ্ঠিসমূহ মনে করে বর্মীরা স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দুমুখো নীতি গ্রহণ করেছে। প্যানলং সম্মেলনের কোন অংগীকার বার্মার সরকার অনুসরণ করেনি। অতীতেও বর্মী জাতির প্রতি পাহাড়ী জাতিসমূহের যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। ফলে স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় 'বর্মী ও অ-বর্মী'দের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। বার্মার সামরিক সরকার অথবা বার্মার জনগণের কাংখিত গণতান্ত্রিক সরকার, কেহই বিশাল সংখ্যালঘূ জনগোষ্ঠির চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যেতে পারবেন বলে কেহ মনে করেন না।

বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভারত হতে আগত বার্মায় বসবাসকারী নাগরিক

১৮৮৫ সালে সংঘটিত তৃতীয় এংলো-বার্মা যুদ্ধের পর সমগ্র বার্মার শাসন ক্ষমতা রাজা থিব থেকে বৃটিশদের দখলে চলে যায়। শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের পর নতুন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বার্মায় ভারতীয়দের জন্যে নানা কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয়। ফলে রেংগুন কেন্দ্রীক ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য

নানাবিধ কর্মকান্ডে ভারতীয়দের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়। এর প্রধান কারণ হলো বর্মীদের অনগ্রসরতা, অশিক্ষা ও গ্রাম কেন্দ্রীক জীবন যাপনের অভ্যস্থতা।

বিশের দশকের পর বার্মায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ সময় অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বর্মীদের গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার হিড়িক পড়ে। ফলে, শহরের কর্মের জগতে বর্মীরা ভারতীয়দের তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।[৮]

বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্লোগান ছিল "বার্মা বর্মীদের জন্য (Burma for the Burmese)"। কিন্তু বৃটিশ সরকার একে প্রচার করে "বার্মা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বর্মীদের জন্যে (Burma for the Buddhist Burmans)"। একই সাথে বৃটিশ সরকার প্রচার করল, "বার্মার মুসলমানেরা হলো বহিরাগত (Burmese Muslims are foreign immigrants or Kalas)"। বৃটিশ সরকারের এ নীতি মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলে, যা অতীতে কখনো ছিল না। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৪৬ সালের সংবিধানে বার্মায় বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখার লক্ষ্যে রেংগুনস্থ বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু বৃটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করেন নি। এমন কি মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকার পর্যন্ত দেন নি।[৯]

প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সরকারই সুকৌশলে মুসলমান বিরোধী এই সাম্প্রদায়িক চেতনা বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ফলে, বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে একটি বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি অব্যাহতভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালের বর্মী-ভারতীয় দ্বন্দ্ব, ১৯৩৮ সালের বৌদ্ধ-মুসলিম দাংগা, ১৯৪২ সালে আরাকানের নৃশংস রোহিঙ্গা হত্যা প্রভৃতি বৃটিশ সরকারের সৃষ্ট বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার ফলশ্রুতি।

আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, বার্মার মুসলমানেরা বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহযোগিতা করে, সমর্থন জুগিয়ে, অংশগ্রহণ করে বর্মীদের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করার অব্যাহত প্রয়াশ নিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় বর্মী নেতৃবৃন্দ ইউনিয়ন অব বার্মার সকল জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও ভাবের মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক নীতি ও রাজনৈতিক ঐক্যের অনুকূল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারার কারণে বার্মার মানুষের দূর্ভোগ বেড়েছে বৈ কমেনি।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্বাধীকার আন্দোলন

বার্মার সংবিধানে রোহিঙ্গারা "আরাকানী মুসলমান" নামে পরিচিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় রোহিঙ্গারা অতীতে জাতিগত পরিচয়ে কোন সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেনি। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর রোহিঙ্গারা জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

বার্মার সাংবিধানের ১১ (১) ধারা মতে বার্মার নৃতাত্ত্বিক বা বুনিয়াদী জাতিসমূহের যেকোন সদস্য বার্মার নাগরিক। পক্ষান্তরে, আরাকানী মুসলমানেরাও বার্মার নাগরিক। কিন্তু আরাকানী মুসলমানদের সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। চেহারাগত বৈশিষ্ঠে আরাকানী মুসলমানেরা ভারতীয়দের অনুরূপ এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্মীদের বহুকাল ধরে লালন করা ক্ষোভ বর্তমান। ফলে আরাকানের একটি মগ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি রোহিঙ্গাদের ভারতীয় বহিরাগত হিসেবে আখ্যায়িত করে বর্মীদের সহজ দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে অপপ্রচার শুরু করে।

এমতাবস্থায় রোহিঙ্গারা বার্মার সংবিধানে নৃতাত্ত্বিক বা বুনিয়াদী জাতিসমূহের তালিকায় রোহিঙ্গা জাতির নাম অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানায়। বুনিয়াদী জাতির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বার্মার সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে "যে সমস্ত জনগোষ্ঠি একটি স্বকীয় জাতিগত বা গোষ্ঠিগত বৈশিষ্ট নিয়ে ইউনিয়ন অব বার্মার অধীন কোন অঞ্চলে ১৮২৩ সালের পূর্বহতে ক্রমাগতভাবে বসবাস করে আসছে, ঐ সকল গোষ্ঠি বুনিয়াদী জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে। বলাবাহুল্য, "রোহিঙ্গা" একটি ভাষা ভিত্তিক জাতির নাম। আরাকানে বসবাসকারী রোহিঙ্গারাই এ ভাষায় কথা বলে।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৮ সালে রোহিঙ্গারা এমন এক সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে যখন রোহিঙ্গাদের ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর বিলাপ চলছিল। ১৯৪২ সালে মগ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি কতৃক পরিচালিত পৃথিবীর এই নৃশংসতম গণহত্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, দেশ ছাড়া হয়েছে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ বর্মী সরকারের কাছে ১৯৪২ সালের গণহত্যার উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানায়। রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ ১৯৪২ সালে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের স্বীয় বসতভিটায় পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা নেয়ার

জন্যে আবেদন জানায়। কিন্তু AFPFL সরকার সকল দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারী চাকুরী হতে রোহিঙ্গাদের অপসারণ করে তদস্থলে রাখ্যাইনদের নিয়োগ দেয়। ফলে, বিক্ষুব্ধ রোহিঙ্গাদের একটি দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে সশস্ত্র বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। পরবর্তীতে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গারা বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রথমে মোহাম্মদ জাফর কাওয়াল নামক জনৈক যুবক এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। কাওয়ালী গাইতেন বলে তিনি জাফর কাওয়াল নামে পরিচিত। তিনি নিজেই রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দূর্দশা নিয়ে গান রচনা করতেন, গানের মাধ্যমে সরকারের জুলুম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতেন এবং রোহিঙ্গাদের বাঁচার একমাত্র পথ সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানের জন্য রোহিঙ্গা যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই শত শত লোক তার অনুগামী হত এবং তাঁর বিপ্লবাত্মক গানের কথা শুনে দলে দলে লোক বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান করত। বার্মার জনগণের কাছে ইহা মুজাহিদ বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

মোহাম্মদ জাফর কাওয়ালের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ আব্বাস বিদ্রোহী দলের মূল নেতৃত্বে আসেন। পরে মোহাম্মদ আব্বাসের নেতৃত্বাধিন বাহিনী হতে দলত্যাগী কিছু বিদ্রোহী মোহাম্মদ কাসিম নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আলাদা হয়ে বর্মী সৈন্যদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে মুজাহিদ বিদ্রোহ নেতৃত্বহীন হয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি কারেন জাতির একটি সশস্ত্র দল কারেনদের স্বাধীন আবাসভূমির দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আরাকানের রাখ্যাইন সম্প্রদায়ের একটি দল আরাকান ন্যাশনাল লিবারেশন পার্টি নামে আরাকানের স্বাধীনতা দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। আস্তে আস্তে এই বিদ্রোহ অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সমগ্র বার্মা চতুর্দিকে অবস্থিত সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু পাহাড়ী জাতিসমূহের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

প্রকৃতপক্ষে বার্মার সংখ্যালঘু জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র রোহিঙ্গারাই বার্মার কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামোর অধীনে সমস্যার সমাধান চেয়েছে। অথচ বার্মার প্রচার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকেই সবচাইতে বেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যাহোক, বার্মার স্বাধীনতার পরপর রোহিঙ্গা জাতি পরিচয়ে বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। রোহিঙ্গারা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে বার্মার সংবিধানে একটি বুনিয়াদী জাতি হিসেবে 'রোহিঙ্গা' নামটি অর্ন্তভুক্ত করার দাবি জানায়।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে এসে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংখ্যলঘু জাতিসমূহের পক্ষ থেকে বার্মার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। কারন বিদ্রোহীরা রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠে এসে চোরা গুপ্তা হামলা চালাতে থাকে। ১৯৫৮ সাল অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা অর্জনের দশ বৎসর আসতে না আসতেই প্যানলং সম্মেলনের শর্ত মোতাবেক সাংবিধানিক পন্থায় শান ও কায়া জাতি কেন্দ্রীয় সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

এমতাবস্থায়, ১৯৫৮ সাল আসতেই প্রধানমন্ত্রী উ-নূ দেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্যে সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল নে-উইনের নেতৃত্বাধীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশের শাসনভার অর্পন করেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত জেনারেল নে-উইন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী উ-নূ এর কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়।

১৯৬০ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী উ-নূ বার্মার ফেডারেশনের অধীন সংখ্যা লঘূ সমস্যা সমাধানের জন্য সক্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রোহিঙ্গারা উ-নূর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। উ-নূ সরকার উত্তর আরাকানের রোহিঙ্গা প্রধান অঞ্চল নিয়ে MEYU FRONTIER ADMINISTRATION গঠন করে এ অঞ্চলকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। আরাকানের মগ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি প্রভাবিত স্টেট সরকার এর নির্যাতন থেকে রোহিঙ্গাদের রক্ষা করার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবশ্য রাখ্যাইন সম্প্রদায় একে বার্মা সরকারের ডিভাইড এন্ড রুল নীতি বলে অভিহিত করেন এবং আরাকানের কালা (Kala বা বহিরাগত) দের রক্ষার জন্যে সরকারের এ উদ্যোগকে হাস্যস্পদ বলে অভিহিত করেন। পক্ষান্তরে রোহিঙ্গারা এ উদ্যোগকে 'একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠির হাঁফছেড়ে বাঁচ' বলে উল্লেখ করেন।

১৯৬০ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী উ-নূ রেংগুন বেতার কেন্দ্র হতে রোহিঙ্গাদের জন্যে রোহিঙ্গা ভাষায় একটি অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ

করেন। বার্মার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বার্মার একটি বুনিয়াদী জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী উ-নূ রোহিঙ্গাদের একটি শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে উল্লেখ করে বিদ্রোহী সশস্ত্র মুজাহিদদের আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানান। উ-নূর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৬১ সালের ৪ঠা জুলাই সকল রোহিঙ্গা মুজাহিদ অস্ত্র সমর্পণ করেন।

এই অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে বার্মার ভাইস চীফ অফ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার অংজী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা 'মেয়ু শিরে' শিরোনামে বার্মা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করে প্রচার করা হয়।

ব্রিগেডিয়ার অংজী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, "রোহিঙ্গারা আরাকানেরই শান্তিপ্রিয় নাগরিক। বার্মা সরকারের তরফ থেকে শুধুমাত্র ভুল বুঝাবুঝির কারণে রোহিঙ্গাদের প্রতি বহু অন্যায় করা হয়েছে, যা ভুল বুঝাবুঝি অপসারণের মাধ্যমে দূরীভূত হয়েছে।" ব্রিগেডিয়ার অংজী আরও উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীর সব সীমান্তে একই জাতি সীমান্তের দুই পারে বসবাস করে। এজন্যে কোন নাগরিকের জাতীয়তা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়।"

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ২রা মার্চ ১৯৬২ইং তারিখ জেনারেল নে-উইন এর সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে রোহিঙ্গাসহ বার্মার সকল সংখ্যালঘু জাতি সমূহের সাংবিধানিকভাবে সকল অর্জিত অধিকার বাতিল করে দেয়। ফলে রেহিঙ্গারা যে তিমির সে তিমিরেই পতিত হয়।

বার্মার নাগরিকত্ব আইনের উপর দু'টি বিখ্যাত মামলা

(ক) হাসান আলী ও মূসা আলী মামলা

১৯৫৮ সালে জেনারেল নে-উইন এর নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বার্মার প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আরাকানের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এক বেপরোয়া উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে দেয়। এই উচ্ছেদ অভিযানের শিকার হয়ে প্রায় বিশ হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু কক্সবাজার সীমান্তে পালিয়ে আসে। তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পাকিস্তান পক্ষ ও বার্মা পক্ষের মধ্যে কক্সবাজারে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বর্মী

পক্ষ একে আকিয়াবের একটি সাম্প্রদায়িক মগ গোষ্ঠির কারসাজি বলে অভিহিত করেন এবং সকল উদ্বাস্তুদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেন।[৭৭]

এই উচ্ছেদ অভিযানকালে বার্মার ইমিগ্রেশন পুলিশ মংডু মহকুমা হতে শতাধিক রোহিঙ্গাকে বন্দী করে। ইমিগ্রেশন পুলিশ বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় উল্লেখ করেন যে, বন্দীরা বার্মার নাগরিক নয়; কেননা, বন্দীরা ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের নাগরিকত্বের সমর্থনে কোন প্রমাণপত্র দেখাতে পারেন নি।

ইমিগ্রেশন পুলিশ নির্দিষ্ট ফরমে বন্দীদের নাম পূরণ করে বার্মা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার আদেশনামা জারীর জন্যে পূরণকৃত ফরম মংডুর মহকুমা প্রশাসক সমীপে উপস্থাপন করেন। মহকুমা প্রশাসক আদেশনামা জারী করে সংশ্লিষ্ট ফরমে দস্তখত করেন। অতঃপর, বার্মা থেকে বিতাড়নের আদেশ কার্যকর করার জন্যে বন্দীদের রেংগুনে নিয়ে আসা হয়।

বন্দীদের মধ্যে হতে হাসান আলী ও মূসা আলী নামে দুই ব্যক্তি বার্মার সুপ্রীম কোর্ট বরাবরে ফরিয়াদ জানায় যে, তাদের অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে। বন্দীদ্বয় দাবি করেন যে, তারা বার্মার বৈধ নাগরিক। অভিযোগ করে বন্দীদ্বয় জানান যে, ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয় নি। মহামান্য আদালত ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৯ তারিখ বন্দীদ্বয়কে মুক্তিদেয়ার জন্যে নির্দেশ দেন। অতঃপর বন্দীদের মধ্যে হতে আরও ৭৬ জন বন্দী সুপ্রীম কোর্টের আদালতে ফরিয়াদ জনান। মহামান্য আদালত বন্দীদের মুক্তি দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেন। এরপর ইমিগ্রেশন পুলিশ কর্তৃক একইভাবে অভিযুক্ত ২৩ জন বন্দী পুনরায় সুপ্রীম কোর্ট বরাবরে হেবিয়াস কার্পাস বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের জন্য আবেদন জানায়।

এরপর সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আদালত বন্দীদের মুক্তিদানের আদেশ দিয়ে দীর্ঘ এক নির্দেশনামা জারী করেন। নির্দেশনামায় বিজ্ঞ বিচারপতি উল্লেখ করেন যে, বার্মার ইমিগ্রেশন পুলিশ সুপ্রীম কোর্টের পরপর দু'টি নির্দেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম নির্দেশে হাসান আলী ও মূসা আলী নামক দু' বন্দীকে মুক্তি দেয়ার জন্যে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। সংগত কারনেই ইমিগ্রেশন পুলিশের উচিত ছিল একই কারণে আটককৃত সকল বন্দীদের মুক্তি দেয়া। কিন্তু তা করা হয়নি। এরপর অপর ৭৬ জন বন্দীকে মুক্তিদেয়ার জন্য বিজ্ঞ বিচারপতি পুনরায় নির্দেশ জারী করেন। এক্ষেত্রে ও ইমিগ্রেশন পুলিশ

সুপ্রীম কোর্ট এর নির্দেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরও একই অভিযোগে আটককৃত অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়নি। অতঃপর মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আরও ২৩ জন বন্দীকে মুক্তিদেয়ার জন্যে নির্দেশ জারী করতে হয়েছে।

নির্দেশনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, ইমিগ্রেশন কর্তৃক উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট ছাপানো ফরমে মংডুর মহকুমা প্রশাসক কোন বিচার বিবেচনা ব্যতীরেকে দস্তখত করেছেন, যার অর্থ ছিল বে-আইনীভাবে কিছু দেশের নাগরিককে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা এবং একজন নাগরিকের অধিকারকে অস্বীকার করা। বিজ্ঞ বিচারক উল্লেখ করেন যে, দেশের একজন নাগরিককে স্বীয় আবাস ভূমি থেকে বিতাড়ন করা মৃত্যুর দন্ডাদেশ দেয়ার সামিল।

আদেশনামায় মাননীয় আদালত প্রত্যক্ষ করেন যে, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের সরবরাহকৃত অভিযোগ বিবরণীতে আটককৃত বন্দীরা বর্মীভাষা জানেন না বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বার্মার নাগরিকত্বের স্বপক্ষে কোন প্রমানপত্র দেখাতে পারেন নি বলে জানিয়েছেন। বিজ্ঞ বিচারপতি এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইউনিয়ন অব বার্মায় বহু ধর্ম, বর্ণ ও জাতি বসবাস করে। বার্মা ইউনিয়নে বহু জাতি আছে যারা বর্মী ভাষা জানেন না। তাই, বর্মী ভাষা জানা বার্মার নাগরিকত্বের আবশ্যকীয় শর্ত নয়। নির্দেশনামার উল্লেখমতে বার্মার সংবিধানের ৪ (২) অনুচ্ছেদের নাগরিকত্বের উপর অধ্যাদেশে বলা আছে যে, ওরা বার্মার নাগরিক যারা বার্মায় জন্মগ্রহণ করেছে, লালিত পালিত হয়েছে এবং যাদের পূর্বপুরুষ বার্মাতে তাদের আবাস গড়ে তুলেছে।

অতএব, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ও মংডুর মহকুমা প্রশাসকের কার্যকলাপ বেআইনী। তাই মাননীয় আদালত সকল বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ জারী করছেন।

(খ) বনসিলাল এর নাগরিকত্ব মামলা

বনসিলাল নামে বার্মার জনৈক নাগরিক বার্মার বাসিন্দা হয়েও বাহিরাগতদের মত ফরেন রেজিস্ট্রেশন কার্ড বা Foreign Registration Card সংগ্রহ করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বনসিলাল তার এফ, আর, সি (Foreign Registration Card) কার্ড নবায়ন করেন নি। ফলে, বনসিলাল বার্মার নাগরিকত্ব আইনে অভিযুক্ত হন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা

হয়, কথিত বনসিলাল এফ, আর, সি গ্রহণ করেছেন; অতএব তিনি বার্মার নাগরিকত্ব হারিয়েছেন।"

বনসিলাল আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নিয়ে আদালতে রীট আবেদন করেন। কথিত বনসিলাল দাবি করেন যে, তিনি ভুল ধারনায় বশবর্তী হয়ে এফ, আর, সি কার্ড সংগ্রহ করেছেন। ফরিয়াদীর দাবি মতে তিনি বার্মায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার পিতা-মাতা ও বার্মায় জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব, তিনি বার্মার নাগরিক।

মামলার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে হাইকোর্টের মাননীয় আদালত বলেন যে, এফ, আর, সি গ্রহণের দায়ে কোন নাগরিক নাগরিকত্ব হারায় না। বিজ্ঞ বিচারপতি উল্লেখ করেন যে, বনসিলাল বার্মায় জন্মগ্রহণ করেছেন, বার্মায় প্রতিপালিত হয়েছেন এবং বার্মায় স্বীয় আবাস গড়ে তুলেছেন। অতএব, সংবিধানের ৪ (২) ধারা অনুযায়ী তিনি বার্মার নাগরিক।"

বর্মী জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ইউনিয়ন অব বার্মার সংখ্যালঘু সমস্যা

১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত প্যানলং সম্মেলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়ন অব বার্মার স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হলো একটি ফেডারেল সরকার কাঠামোর অধীনে বার্মা ইউনিয়ন শাসিত হবে। সম্মেলনে ঐক্যের সংজ্ঞা অর্থ বলা হয়েছিল বার্মার ইউনিয়নের ঐক্য বলতে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য বা Unity in the diversity বুঝানো হবে।

ইউনিয়ন অব বার্মা একটি বহুজাতিক দেশ। যথাঃ বর্মী জাতি, মুন জাতি, শান জাতি, কারেন জাতি, কাচিন জাতি, সীন জাতি, কায়া জাতি, লা-উ জাতি, লিসু জাতি, রাখ্যাইন জাতি ইত্যাদি। বার্মার সংবিধানে প্রায় একশত চল্লিশটি জাতির নাম উল্লেখ করে 'ইত্যাদি' বলে শেষ করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ আরও অনেক জাতি আছে যাদের নাম এখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রোহিঙ্গারা দাবি করছে, বুনিয়াদী জাতি গোষ্ঠি সমূহের নামের তালিকায় রোহিঙ্গা নামটিও অন্তর্ভূক্ত করা হোক; কেননা, সংবিধানে দেয়া বুনিয়াদী জাতির সংজ্ঞা অনুসারে রোহিঙ্গারা বার্মার অন্যতম বুনিয়াদী জাতি। সংবিধানে বুনিয়াদী জাতির সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে, "যে সমস্ত জাতি গোষ্ঠি বর্তমান ইউনয়ন অব বার্মার স্বীকৃত

ভূখন্ডে ১৮২৩ সালের পূর্ব হতে জাতিগতভাবে কিংবা গোষ্ঠীগতভাবে বসবাস করে আসছেন তারা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে পরিগনিত হবে।" নাগরিকত্ব আইনের ১১ (১) ধারা মতে বুনিয়াদী জাতির যে কোন সদস্য বার্মার নাগরিক।

বার্মা ইউনিয়নের বহু জাতির মধ্যে 'বর্মী' অন্যতম একটি জাতি। জনসংখ্যার দিক থেকে সকল জাতির মধ্যে বর্মী জাতির জনসংখ্যা সর্বাধিক। তবে সকল জাতির মিলিত জনসংখ্যা বর্মীদের চেয়ে অধিক।

স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলনের নীতি অনুসৃত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী উ-নূর নেতৃত্বাধীন AFPFL নেতৃবৃন্দ বর্মী ভাষাও বর্মী সংস্কৃতিকে বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের কাঠামোতে সম্পৃক্ত করে সর্ববার্মার জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়। বার্মার সামরিক সরকার বর্মী ঐক্যের এই কাঠামোকে শক্তি ও শৌয্য-বীর্য দিয়ে শক্তিশালী করে সকল সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীসমূহের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াশ নেয়।

বর্মী নেতৃত্বের এই সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি সর্ববার্মায় সংখ্যালঘূ জাতিসমূহ মেনে নিতে পারছে না। সংখ্যালঘূ জাতিসমূহ প্যানলং সম্মেলনের স্বীকৃত নীতি অনুসারে একটি ফেডারেল সরকার পদ্ধতি চায়। বলাবাহুল্য এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু জাতিকে কেন্দ্রীয় সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। বার্মার বিদ্রোহী সকল সংখ্যালঘূ জাতিসমূহ মনে করে, ঐতিহাসিক প্যানলং সম্মেলনের আলোকে একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেশন সরকারের মধ্যেই বর্মী নেতৃত্ব তথা বর্তমান মায়ানমারের নেতৃত্বকে সমাধান খুঁজে নিতে হবে। সংখ্যালঘূ জাতিসমূহ আরও মনে করে, মায়ানমার নেতৃত্বকে এ মুহূর্তে সকল সংখ্যালঘূ জাতি সমূহের আস্থা অর্জনে যথেষ্টভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

তথ্যপঞ্জী

১। আলী, শাহেদ, বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান।

২। প্রাগুক্ত।

৩। করিম, ডঃ আবদুল, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ১৯৮০।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। Yegar, Moshe. The Muslims of Burma. otto Horrassowitz, Wiesbaden, 1970.

৬। আমিন নদভী, মোহাম্মদ, তাওয়ারিখে আরাকান কা এক গুমসূদা বাব।

৭। প্রাগুক্ত।

৮। প্রাগুক্ত।

৯। প্রাগুক্ত।

১০। ঐতিহাসিকগণ ম্রাউক-উ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম 'মিন স মোয়ান' (Min Saw Muan) উল্লেখ করেছেন। বার্মার ঐতিহাসিকগণ তার নাম উল্লেখ করেছেন নরমিখলা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় 'মিন স মোয়ান' নরমিখলার পরিবর্তিত নাম। 'মিন স মোয়ান এর মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা মিনখরী (রাজত্বকাল ঃ ১৪৩৪-১৪৫৯) আলী খান নামধারণ করে রাজত্ব করেন। অতএব, 'মিন স মোয়ান' নরমিখলার মুসলিম নাম হওয়াটাই যুক্তিসংগত। ম্রাউক-উ-বংশের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় প্রত্যেক রাজা একটি মুসলিম নাম গ্রহণ করে রাজ্যশাসন করেছেন। বর্মীভাষীদের উচ্চারণ বিকৃতির কারনে মোহাম্মদ সোলায়মান নামটি বিকৃত হয়ে মিন স মোয়ান হয়েছে বলে অনেক গবেষকের মত আমাদেরও ধারণা। তাই, বর্তমান গ্রন্থে ম্রাউক-উ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নাম মিন স মোয়ান এর স্থলে মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ লিখা হয়েছে।

১১। Smart, R. B. Burma Gazetteer, Akyab District, Vol-4, 1957, P-17.

১২। হক চৌধুরী, আবদুল, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৮০।

১৩। প্রাগুক্ত।

১৪। Collis, M. S. Arakan's place in the Civilization of Bay (in Collaboration with san shwe Bu), Fiftieth Anniversary Publication No 2, Burma Research Society, Rangoon, 1960.

১৫। প্রাগুক্ত, Arakan's place in the civilization of Bay

১৬। নশরুল্লাহ খোন্দকার, শরিয়তনামা, উধৃতিঃ চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি প্রাগুক্ত।

১৭। সাহিত্যবিশারদ, আবদুল করিম, ইসলামাবাদ, সম্পাদনা ঃ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

১৮। Harvey, G. E. Outline of Burmese History.

১৯। Pearn, B. R. King-Bering, Fiftieth Anniversary Publication No 2, Burma Research Society, Rangoon, 1960

২০। Harvey, G. E. Outline of Burmese History.

২১। প্রাগুক্ত।

২২। ম্রাউক-উ বংশের রাজাদের বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য, Arakan's place in the civilization of Bay, প্রাগুক্ত।

২৩। Harvey, G. E. Outline of Burmese History.

২৪। প্রাগুক্ত।

২৫। Collism M. S. Arakan's place in the civilization of Bay প্রাগুক্ত।

২৬। King-Bering, প্রাগুক্ত।

২৭। Arakan's Place in the Civilization of Bay, প্রাগুক্ত।

২৮। Genealogy of Sufi Abu Mohd. Waheed, Extracts from the Family of the Great Sufi Hazrat Mohammad Muquim Al-Mujahid by Zahiruddin Ahmed, B. A. D. T. Chittagong.

২৯। প্রাগুক্ত।

৩০। King-Bering. প্রাগুক্ত।

৩১। Genealogy of sufi Abu Mohd. Waheed. প্রাগুক্ত।

৩২। Arakan's Place in the Civilization of Bay. প্রাগুক্ত।

৩৩। প্রাগুক্ত।

৩৪। প্রাগুক্ত।

৩৫। প্রাগুক্ত।

৩৬। আলী, শাহেদ, বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান।

৩৭। প্রাগুক্ত।

৩৮। Maung than Lwin, Arakani Kalas.

৩৯। করিম, ডঃ আবদুল, চট্টগ্রামে ইসলাম, প্রাগুক্ত।

৪০। Hall, D. G. E, Studies in Dutch Relation With Arakan, Fiftieth Anniversary Publication No-2, Burma Research Society, Rangoon, 1960.

৪১। O' Malley, L. S. S, Eastern Bengal District Gazetteer, The Bengal Secretariate Book Depot, Calcutta, 1908.

৪২। করিম, ডঃ আবদুল, চট্টগ্রামে ইসলাম, প্রাগুক্ত।

৪৩। Furnival, J. S, The Early Portuguese Europeans in Burma, Fiftieth Anniversaty Publication No-2, Burma Research Society, Rangoon, 1960.

৪৪। Arakan's Place in the Civilization of Bay. প্রাগুক্ত।

৪৫। সাহিত্যবিশারদ, ইসলামাবাদ, প্রাগুক্ত।

৪৬। প্রাগুক্ত।

৪৭। প্রাগুক্ত।

৪৮। Hall, D. G. E, stubies in Dutch Relation with Arakan, Burma Research Society, প্রাগুক্ত।

৪৯। Harvey, G. E. outlines of Burmese History.

৫০। সুকুমার সেন, শ্রী, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ইস্টার্ন পাবলিসার্স, কলিকাতা-৯, ১৯৬৩, পৃঃ ৩২৮।

৫১। Harvey, G. E. outlines of Burmese History.

৫২। Arakan's Place in the Civilization of Bay, প্রাগুক্ত।

৫৩। O' Malley, L. S. S, Eastern Bengal District Gazetteer. প্রাগুক্ত।

৫৪। প্রাগুক্ত।

৫৫। প্রাগুক্ত।

৫৬। করিম, ডঃ আবদুল, চট্টগ্রামে ইসলাম, প্রাগুক্ত।

৫৭। চাকমা, সুব্রত, চাকমা জাতির ইতিহাস।

৫৮। প্রাগুক্ত।

৫৯। প্রাগুক্ত।

৬০। King-Bering, প্রাগুক্ত।

৬১। প্রাগুক্ত।

৬২। প্রাগুক্ত।

৬৩। Eastern Bengal District Gazetteer., প্রাগুক্ত।

৬৪। হক চৌধুরী, আবদুল, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত।

৬৫। Yegar, Moshe. The Muslims of Burma, প্রাগুক্ত।
৬৬। আলী আহসান, সৈয়দ, পদ্মাবতী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১, ১৯৬৮।
৬৭। Genealogy of sufi Abu Mohd. Waheed, প্রাগুক্ত।
৬৮। সুকুমার সেন, শ্রী, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত।
৬৯। হক চৌধুরী, আবদুল, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত।
৭০। প্রাগুক্ত-৪০।
৭১। প্রাগুক্ত ২৩, ২৪, ৪৯।
৭২। প্রাগুক্ত ৪০, ৪৮।
৭৩। সাহিত্যবিশারদ, আবদুল করিম, ইসলামাবাদ, প্রাগুক্ত।
৭৪। প্রাগুক্ত।
৭৫। King-Bering, প্রাগুক্ত।
৭৬। প্রাগুক্ত।
৭৭। Smart, R. B. Burma Gazetteer, Akyab District, Vol-A, Rangoon, 1957.
৭৮। প্রাগুক্ত।
৭৯। প্রাগুক্ত।
৮০। Yegar, Moshe. The Muslims of Burma, প্রাগুক্ত।
৮১। প্রাগুক্ত।
৮২। Suu Kyi, Aung San, Freedom From Fear and other Writings, Penguin Books, 1991.
৮৩। প্রাগুক্ত।
৮৪। প্রাগুক্ত।
৮৫। প্রাগুক্ত।
৮৬। প্রাগুক্ত।
৮৭। প্রাগুক্ত।
৮৮। Azad, Abul Kalam, India win's Freedom
৮৯। Silverstein, Josef, Minority problems in Burma since 1962, Edited by Lehman, F. K. Military Rule in Burma Since 1962, Maruzen Asia, 1981.
৯০। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত।
৯১। প্রাগুক্ত - ৮৯।
৯২। Yegar, Moshe. The Muslims of Burma, প্রাগুক্ত।
৯৩। প্রাগুক্ত।
৯৪। প্রাগুক্ত।
৯৫। প্রাগুক্ত- ৮২।
৯৬। The Daily Guardian, Rangoon, 27th October 1960, "Supreme Court quashes Expulsion orders against Arakanese Muslims
৯৭। The Pakistan Times, 27th August, 1959 - Burma ready to take back all the refugees, negotiations going on Zakirs statement Chittagong August 26: The Burmese Government is agreeable to take back their nationals who had entered in Pakistan as refugees

This was disclosed by the Governor, Mr Zakir Hussain, at the Patenga airport this morning just after his return from Cox's Bazar

The Governor added that negotiations between the Government of Burma and Pakistan were going on in this behalf.

Replying to a question from a reporter, the Governor said that the refugee problem at the Pak-Burma border was under insvestigation of the Government.

Asked about the number of refugees in Cox's Bazar, Mr. Zakir Hussain revealed that it was over 10,000.

Questioned why refugees were pouring into Pakistan from Burma, Governor replied that the Government of Burma had nothing to do with it. Actually the Mughs of Akyab were creating the trouble, he added.

The Governor disclosed that the Deputy Commissioner of Chittagong with Hilltracts Mr. Iqbal Karim was deputed to investigate onto the question of the influx of refugees and then to report to him (the Governor).

Mr. Kaisar Rashid, Vice-Consul for Pakistan at Akyab, who also returned to Chittagong in the same plane with the Governor, said that the number of refugees were 12,000 App.

৯৮। The Pakistan Times, 27th August 1959.

৯৯। The Nation, Rangoon, 3rd March, 1959. "Citizenship Not Lost By Taking Out FRC."

১০০। প্রাগুক্ত।

এন. এম. হাবিব উল্লাহ একজন সচেতন প্রতিবাদী প্রাবন্ধিক ও গবেষক। ১৯৪৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের পোকখালী গ্রামে তার জন্ম। পিতা মরহুম আলহাজ্ব আবদুল জলীল (এডভোকেট) এবং মাতা গুলবাহার বেগমের চার পুত্র চার কন্যার মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। লেখালেখি তার নেশা কিংবা পেশা নয়। তিনি লেখেন সময়ের তাগিদে, প্রয়োজনের খাতিরে। পেশাগত জীবনে তিনি একজন অধ্যাপক। গণিত শাস্ত্রে এম. এসসি (প্রথম শ্রেণী)তে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকারি কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে উপ–পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং লন্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন হতে ম্যানেজম্যান্ট অব ট্রেনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

'রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস' তার ইতিপূর্বে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালার একটি অনন্য সংকলন গ্রন্থ। তিনি প্রায় দু'দশক ধরে এ দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখে আসছেন। বাংলাদেশী লেখকদের মধ্যে রোহিংগাদের উপর সম্ভবত তিনিই সর্বাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তিনি এ গবেষণা কাজের দ্বারা বাংলাদেশেরজনগণের পক্ষ থেকে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমাদের স্মরণকালে তিন-তিনবার আরাকানে রোহিঙ্গা জাতির ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্ত উত্তপ্ত হয়েছে এবং দু' সরকারের মধ্যে বহু দেন-দরবার হয়েছে।

১৯৫৮ সালে একবার রোহিঙ্গারা আরাকান থেকে নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ও বার্মার মধ্যে সরকারি পর্যায়ে দেন-দরবার হয়। বার্মা সরকার পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেয় এবং আকিয়াবের কিছু মগ এই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল বলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি প্রতিনিধিদের জানায়।

আরো দু'দফায় রোহিঙ্গা ইস্যুটি পৃথিবীর গণমাধ্যমসমূহে স্থান দখল করে নেয়। ১৯৭৮ সালে আরাকান হতে বিতাড়িত হয়ে কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে আসলে পর রোহিঙ্গা ইস্যুটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ ও বার্মা সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক দেন-দরবারের পর বার্মা সরকার সকল উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নেয়।

১৯৯২ সালের শুরু হতে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা পুনরায় উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রেও কূটনৈতিক দেন-দরবার হয়েছে এবং মায়ানমার সরকার উদ্বাস্তুদের ফেরত গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।

রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক [illegible] সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের যথেষ্টভাবে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। কেননা এই ইস্যুটি নিয়ে সৃষ্ট বিবাদে বাংলাদেশ অন্যতম প্রতিপক্ষ॥